পঞ্চাশের পরে

ডাঃ জ্যোতির্ময় ঘোষ

এম. এ. (কলি.), পি-এচ.ডি. (এডিন.) এফ. এন. আই.

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা - ৬

আশ্বিন—১৩৬৩

দুই টাকা আট আনা

ভূমিকা

যুগান্তর, স্বাস্থ্যশ্রী প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রোগ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রবন্ধের সহিত আরো কয়েকটি প্রবন্ধ একত্রিত করিয়া প্রকাশিত হইল। ইহা পাঠ করিয়া যদি একটি ব্যক্তিরও রোগপ্রতিষেধ বা রোগোপশমের সহায়তা হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

প্রবন্ধগুলিতে বর্ণিত রোগগুলির অধিকাংশই অধিক বয়সের রোগ। এই জন্য প্রথম প্রবন্ধের নামানুসারে পুস্তকখানির নামকরণ করা হইল।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

পঞ্চাশের পরে

আমাদের দেশের লোকের গড়পড়তা আয়ু প্রায় ত্রিশ বৎসর। সুতরাং যাঁহারা ত্রিশ বৎসরের বেশি বাঁচেন, তাঁহাদের আয়ু গড় আয়ু অপেক্ষা বেশি। কেহ কেহ আশি নব্বই বৎসর পর্যন্ত বাঁচেন। তাঁহাদিগকে সাধারণের ব্যতিক্রম বলিয়াই মনে করিতে হইবে। চল্লিশ বৎসরের পর হইতেই অধিকাংশ ব্যক্তির স্বাস্থ্যে বিবিধ প্রকার গুরুতর ব্যাধির সূচনা পরিলক্ষিত হয়। আমি সাধারণভাবেই কথাগুলি বলিতেছি। ব্যতিক্রমের কথা বলিতেছি না। তারপর পঞ্চাশ পার হইলে, শরীরের প্রাণশক্তি অতি নিশ্চিতরূপেই হ্রাস পাইতে থাকে। সুতরাং এই সময়ের পর হইতে আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক।

পাকস্থলী ও অন্ত্রের পরিপাকশক্তি অনেক কমিয়া যায়। সেইজন্য আহারাদি সম্পর্কে অতিশয় সাবধানতা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের প্রাত্যহিক আহার-গ্রহণের অভ্যাসের ফলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য পরিপাক করিবার জন্য পাকস্থলী হইতে, যকৃৎ হইতে, পিত্তস্থলী হইতে বিবিধ প্রকার রস নিঃসৃত হয়। আহার্য না পাইলেও, অভ্যাসের ফলেই নির্দিষ্ট সময়ে ঐ সকল নিঃসরণক্রিয়া হইতে থাকে। ফলে শূন্য পাকস্থলী, ডুয়োডেনাম বা অন্ত্রে ঐ সকল রস নিষিক্ত

হইয়া রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, নির্দিষ্ট সময়ে আহার না করিয়া পরে অসময়ে আহার করিলে, সে সময়ে আর প্রচুর পরিমাণে পাচক রস পাওয়া যায় না। ফলে পরিপাকের বিঘ্ন ঘটে। এই দ্বিবিধ কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তির, বিশেষ করিয়া বয়স্ক ব্যক্তির কর্তব্য, প্রত্যহ ঠিক এক সময়ে আহার করা। অনেকেরই এ কথা মনে থাকে না। অফিস থাকিলে নয়টায়, আবার অফিস না থাকিলে একটায় খাওয়া অনেকেরই অভ্যাস। পাকস্থলীর এবং অন্ত্রের বহু রোগের মূল কারণ এই অনিয়মিত সময়ে আহার।

বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সাধ্যমত কিছু লঘু ব্যায়াম অতিশয় হিতকারী। এই ব্যায়ামের অভাবে অনেক সময়ে বাত, বহুমূত্রাদি ব্যাধির আক্রমণ হইতে পারে। বাত রোগ বহু প্রকারের আছে। ঠিক কি কি অভ্যাস বা অনিয়মের ফলে বাতরোগ জন্মে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে দেখা গিয়াছে, লঘু ব্যায়াম, আহারে সংযম এবং কোষ্ঠকাঠিন্য পরিহার, এই তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দিলে বাতব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত হইতে পারে। অনেক চিকিৎসকের মত, নিরামিষাশিগণের বাতব্যাধি কম হয়। তবে ইহা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না।

বহুমূত্রব্যাধিরও কারণ নির্ণয় করা কঠিন। তবে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং বহুদিনের ক্রমাগত মানসিক উদ্বেগ অনেক সময়ে এই রোগের উৎপত্তিতে সহায়তা করিয়া থাকে। আমাদের খাদ্যের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় যে পদার্থ

থাকে, তাহার পূরাপূরি পরিপাক (metabolism) না হওয়াই বহুমূত্রব্যাধির আক্রমণের আশু কারণ। এই পরিপাক-ক্রিয়ার পক্ষে পাকস্থলীর সন্নিকটে অবস্থিত প্যান্‌ক্রিয়াস নামক গ্রন্থি হইতে অন্তঃনিঃসৃত ইনসুলিন রস আবশ্যক। এই ইনসুলিন রসের উৎপত্তি ব্যাহত হইলে বহুমূত্ররোগ হইয়া থাকে। প্যান্‌ক্রিয়াসের গায়ের যে সকল সূক্ষ্ম কোষ হইতে ইনসুলিন রস নির্গত হয়, সেগুলি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেলে বাহির হইতে ইনসুলিন রস সরবরাহ ব্যতীত অন্য উপায় থাকে না। এই বহুমূত্ররোগ অতীব প্রাণশক্তিহারক। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বহুমূত্ররোগগ্রস্ত রোগীকে নোনা-ধরা হাঁড়ির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের পর হইতেই সম্যক অবহিত হইলে এই রোগের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নতুবা একবার আক্রান্ত হইলে ইহার প্রতিকার প্রায় অসাধ্য। কার্বোহাইড্রেট ও শর্করাজাতীয় খাদ্য একেবারে বর্জন করিতে পারিলেই ভাল হয়। মৃদু ব্যায়াম, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বর্জন, অনাবশ্যক বিবিধ বিষয় লইয়া উদ্বেগ না করা প্রভৃতি এই রোগের পক্ষে হিতকারী। রোগের প্রথমারম্ভে রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ বাড়িতে থাকে। এই পরিমাণ একটি সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে দেখা যায়, প্রস্রাবের মধ্যেও শর্করা রহিয়াছে। প্রস্রাবের এই শর্করার পরিমাণ হইতে অনেক সময়ে রোগের গুরুত্ব পরিমাপ করা হইয়া থাকে, যদিও রক্তের শর্করা এবং শরীরের অন্যান্য উপসর্গ—যেমন, অবসাদ, ক্লান্তিবোধ, পিপাসা

প্রভৃতিও রোগের গুরুত্বের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই রোগ যে-কোন বয়সেই হইতে পারে। তবে সাধারণত চল্লিশ ও পঞ্চাশের মধ্যেই ইহার আবির্ভাব বেশি ঘটে।

বেশি বয়সের আর একটি অভিশাপ রক্তচাপ (blood-pressure বা hypertension)। হৃদ্‌যন্ত্রের সহিত ইহার সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। অনেক সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগের ফলে রক্ত-চাপরোগ হয়, আবার কখনও কখনও রক্তচাপ হইতে হৃদ্-রোগের উৎপত্তি হয়। এই দ্বিতীয় প্রকার রক্তচাপরোগীর সংখ্যাই বেশি। আমরা সর্বদা যে সকল রক্তচাপরোগীকে দেখি তাহাদের রক্তচাপরোগই মূল রোগ। বেশিদিন এই রোগে ভুগিলে ক্রমশ ইহাদের হৃদ্‌যন্ত্রও আক্রান্ত হইয়া থাকে। রক্তচাপরোগ ঠিক কি কারণে উদ্ভূত হয়, তাহা বলা কঠিন। তবে দেখা গিয়াছে, অত্যধিক মানসিক উদ্বেগ, দৈনন্দিন আহারাদির অভ্যাসে অনিয়ম, বহুদিন ধরিয়া বিবিধ মানসিক অশান্তিভোগ, অত্যধিক গুরুপাকদ্রব্য ভোজন প্রভৃতি এই রোগের সহায়তা করিয়া থাকে। অতৃপ্ত বাসনা রক্তচাপবৃদ্ধির একটি গুরুতর কারণ, এইরূপ অনেক চিকিৎসক মনে করিয়া থাকেন। কারণ যাহাই হউক, এই রোগ একবার আক্রমণ করিলে ইহা হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলে ইহার বৃদ্ধি নিরোধ করিয়া ক্রমশ হ্রাসের পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। ইহার জন্য যে সকল ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই স্থায়ী ফল হয় না। এই রোগের একটি বিশেষত্ব

এই যে, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি দৈনন্দিন অভ্যাস ও কাজকর্মের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। মন যখন নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ থাকে, আহারাদি বিষয়ে সংযম থাকে, তখন রক্তচাপ কম থাকে। সুতরাং এই রোগের সূত্রপাত হইতেই আমাদের দৈনন্দিন কার্য, অভ্যাস প্রভৃতি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে শরীরের বা মনের অনাবশ্যক পরিশ্রম, অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় বা অনাবশ্যক উদ্দীপনা না হয়। যাঁহারা দৈবক্রমে আমাদের দেশে পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়া জীবিত আছেন, তাঁহাদের কোন বিষয়েই অতিরিক্ত উৎসাহ, অতিরিক্ত শ্রম বা অতিরিক্ত উদ্যম স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নহে। আমাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যেটুকু শ্রম বা উদ্বেগ একান্ত অপরিহার্য, তাহার বেশি শক্তিক্ষয় কর্তব্য নহে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেরই দেখা যায়, এই বয়সে একটা অতিচাঞ্চল্য যেন পাইয়া বসে। অর্থ নাই, যশ নাই, পুণ্য নাই, এমন অনেক কাজে তাঁহারা অনাবশ্যকভাবে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া রক্তের চাপ বাড়াইয়া থাকেন।

একটা কথা আছে, 'পঞ্চাশোর্ধ্বং বনং ব্রজেৎ।' ইহার অর্থ এই যে, পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বিবিধ প্রকার গার্হস্থ্য ও সামাজিক কর্তব্য পালন করিবার পর একটা শান্ত, সমাহিত, ধর্মজীবন পালন করাই শ্রেয় ও সঙ্গত। আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় অবশ্য ইহা অনেকের পক্ষেই সম্ভব নহে। তথাপি আমাদের শরীরের ও মনের স্বাস্থ্যধর্ম সম্পূর্ণ অবহেলা করিলে প্রকৃতিদেবী ক্ষমা করিবেন না। যাঁহারা রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা

অন্য কোন উচ্চ মহৎ আদর্শের জন্য শরীরপাত করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উচ্চ, নীচ, শিক্ষিত, অশিক্ষিত জনসাধারণের পক্ষে সাধারণ স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় নিয়ম পালন করিতেই হইবে। বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এ কথা অধিকতর সত্য।

রোগ ও তাহার প্রতিকার

মানুষের রোগ ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব। গভীর তত্ত্বকথা নহে, জনসাধারণের জন্য সহজ-জ্ঞানবোধ্য কয়েকটি কথা মাত্র।

মনে করা যাক, কাহারও খাদ্যনলীতে (এসোফেগাস্) এমন কিছু হইয়াছে, যাহার জন্য কোন খাদ্যদ্রব্য সহজে মুখ হইতে পাকস্থলীতে প্রবেশ করিতে পারে না। খাইবার সময়ে বেশ কষ্ট হয়, খুব বেদনা হয়। অনেক সময়ে হয়তো খাদ্য পাকস্থলীর দিকে একেবারেই যায় না। এমন অবস্থায় যদি ব্যবস্থা করা যায় যে, একটি বাইসাইক্লের পাম্পের মত কোন যন্ত্রদ্বারা গলদেশ হইতে পাকস্থলীর দিকে খাদ্য ঠেলিয়া দেওয়া হউক এবং এই ব্যবস্থা প্রত্যহ বা প্রয়োজনমত দুই-একদিন অন্তর করিয়া যাওয়া হউক, তাহা হইলে কেহই এই চিকিৎসাকে উত্তম চিকিৎসা বলিবেন না। আপনারা বলিবেন, যাহাতে খাদ্যনলীর প্রকৃত অসুখটা সারে, তাহার চেষ্টা করুন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য অবিকল ঐরূপ ব্যবস্থাই আমরা সাধারণত করিয়া থাকি। বিশেষ প্রয়োজনে এইরূপ চেষ্টা অপরিহার্য হইতে পারে। যদি শরীরের এমন কোন অবস্থা হয় (যেমন রক্তচাপ যদি আড়াইশো হয় এবং অত্যধিক কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে) যে, অতি শীঘ্রই অন্ত্রগুলিকে পরিষ্কার করা আবশ্যক, তাহা হইলে ডুস

প্রভৃতির ব্যবহার করিতেই হয়। কিন্তু কোষ্ঠবদ্ধতা রোগের জন্য নিয়মিত বিরেচক (purgative) ব্যবহার বা ডুস প্রভৃতির ব্যবহার আমাদের অনেক পরিবারেই একটা নিয়মিত অভ্যাস হইয়াছে। এখানে মনে রাখিতে হইবে, আমাদের অন্ত্রগুলি ঠিক মিউনিসিপ্যালিটির কন্‌ক্রিটের ড্রেনের মত নহে। ময়লা বেশি জমিলেই প্রকাণ্ড ব্রাশ দিয়া বা হোস পাইপের প্রবল জলপ্রবাহ দিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে এমন ব্যবস্থা হইতে পারে না। অন্ত্রগুলি সজীব ও স্বয়ংক্রিয় শারীরিক যন্ত্র। ঐগুলিকে ক্রমাগত বলপূর্বক পরিষ্কার করিবার চেষ্টা কখনই কর্তব্য নয়। অন্ত্রের যে বিকারের জন্য এবং সমস্ত শরীরযন্ত্রের নিয়ামক প্রাণশক্তির যে বিপর্যয়ের জন্য উহার স্বাভাবিক গতি ও ক্রিয়া ব্যাহত হইতেছে, তাহারই প্রতিবিধান করা কর্তব্য। সহজেই বুঝা যায় যে, এই কার্য ডুস বা পারগেটিভ ব্যবহারের মত সহজ নয়। অন্ত্র বা শরীরের যে কোন অংশের অস্বাভাবিক ক্রিয়া বা অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইয়া সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে বহু সময়, শ্রম ও ধৈর্যের আবশ্যক। আমাদের ব্যস্ত-সমস্ত জীবনে হয়তো সব সময় ইহা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই সময় ও ধৈর্যের অভাবে ক্রমাগত অন্ত্রগুলির উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার করিতে করিতে সেগুলির স্বাভাবিক ক্রিয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্যই দেখা যায়, বহুক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে বিরেচক ঔষধ বা যন্ত্র সারাজীবনের সাথের সাথী হইয়া একটা নিত্যনৈমিত্তিক অভিশাপ হইয়া দাঁড়ায়।

মনে করা যাক, একটি কিশোর বা যুবকের মুখে ব্রণ বাহির

হইতেছে। সাধারণতঃ আমরা এই ব্রণকে চর্মরোগ বলিয়া মনে করি এবং বিবিধ প্রকার মলম ইত্যাদি ব্যবহার করি। কখনও কখনও বেশ জোরালো ঔষধ লাগাইয়া ওগুলিকে শুকাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করি। কিন্তু দেখা যায়, একটা বা তুইটা ব্রণ শুকাইলেও, আবার নূতন নূতন ব্রণ গজাইতে থাকে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বাহির হইতে শুধু চর্মের উপর ঔষধ লাগাইলে ব্রণ উৎপত্তির কারণ দূরীভূত হয় না। আমাদের গাত্রচর্মটা ঠিক বালিশের ওয়াড়ের মত নহে। বালিশের ওয়াড়ে কোথাও ছিদ্র হইলে, সেখানটা রিপু করিয়া দিলেই চলে, বালিশটাকে কিছু না করিলেও চলে। কিন্তু গাত্র চর্মটা মাংস, তন্তু, ধমনী, শিরা, স্নায়ু প্রভৃতি দ্বারা শরীরের অন্যান্য অংশের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। চর্মের উপরে রোগের যে প্রকাশ দেখা যাইতেছে, উহার মূল অনেক ভিতরে। সেই মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করিয়া, সেই মৌলিক রোগ বা বিষক্রিয়ার প্রতিকার করিতে পারিলে, তবেই চর্মের উপরকার রোগ সারিবে। এই তথ্যটা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

বাহিরের আঘাতজনিত পীড়া ব্যতীত অন্য সর্বপ্রকার ব্যাধিই ভিতর হইতে বাহিরে আসে। সুতরাং শুধু বাহিরের উপসর্গগুলি কোনমতে দূরীভূত করিলে মূল কারণ দূরীভূত হয় না। অবশ্য ভিতরের এই মূল কারণ অনুসন্ধান ও অবধারণ সব সময়ে খুব সহজ নয়। কিন্তু এই পন্থা ব্যতীত এই সকল গভীর রোগের সুচিকিৎসাও সম্ভব নয়। অনেক সময়ে অনেক চর্মরোগকে শুধু চর্মেরই রোগ মনে করিয়া তদনুসারে চিকিৎসার

ফলে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে। মনে করুন, কোন ব্যক্তি পায়ের একজিমা রোগে ভুগিতেছেন। সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, এক্ষেত্রেও মলম, প্রভৃতি বহির্মুখী চিকিৎসার ফলে একজিমার কিছু উপশম হইল বটে, কিন্তু দেখা গেল শরীরে অন্য ব্যাধির প্রকাশ হইয়াছে। হয়তো হাঁপানি রোগের আক্রমণ হইল বা পা-খানি অবশ হইয়া গেল। এই হাঁপানি বা অবশতা অন্য কারণেও হইতে পারে। তবে উক্ত চিকিৎসার অব্যবহিত পরেই এই অবস্থা হইলে সকলেই এটিকে চিকিৎসার ফল বলিয়াই মনে করিবেন।

আর একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন এক ব্যক্তির গলার নিকট একটি গ্রন্থি (gland) ফুলিয়া উঠিল এবং বেদনা হইল। বাহ্য সেক, প্রলেপাদিতে কোন সুফল পাওয়া গেল না। তখন অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা মনে করিলেন, ঐস্থানে বাহির হইতে পোকা ঢুকিয়া বাসা করিয়াছে। সুতরাং হয় উপযুক্ত পরিমাণে উপযুক্ত বিষ প্রয়োগ করিয়া ঐ পোকাগুলিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, নচেৎ ঐ দূষিত গ্রন্থিটাকে কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। হয়তো দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করাই স্থির হইল। গ্রন্থিটাকে কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল। পোকা আছে অনুমান করিয়া গ্রন্থিটাকে কাটিয়া ফেলার ব্যবস্থার মধ্যে কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু অন্য একটা পন্থাও চিন্তা করা যাইতে পারে। ঐ গ্রন্থিটা সমস্ত শরীরেরই একটা অংশ। সুতরাং ঐ গ্রন্থির ফুলাটার সহিত সমস্ত শরীরের সম্বন্ধ আছে। ঐ পোকার বাসাটা নিমগাছে কাকের বাসার মত একটা বিচ্ছিন্ন বস্তু নয়। ঐ

গ্রন্থির অসুখটা সমস্ত শরীরযন্ত্রেরই একটি অসুখ। সুতরাং উহার প্রতিকার করিতে হইলে সমস্ত শরীরযন্ত্রের অবস্থা ও বিকার এবং শরীরযন্ত্রের নিয়ামক যে প্রাণশক্তি, তাহারই চিকিৎসা প্রয়োজন।

আমি দুই-একবার 'প্রাণশক্তি' কথাটার উল্লেখ করিয়াছি। পাঠকবর্গ হয়তো ওটাকে একটা নিতান্ত কাল্পনিক কিছু মনে করিতেছেন, কিন্তু তাহা নহে। প্রাণশক্তি কি তাহা এক কথায় বুঝান যায় না। কিন্তু উহার অস্তিত্ব, ক্রিয়া ও বিভিন্নরূপে বহিঃপ্রকাশ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। 'আলো' কি, তাহা সঠিক আমরা কেহই বলিতে পারি না। পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ এখনও পরিষ্কার করিয়া আলোর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আলোর বিভিন্ন গুণ (properties) ও ক্রিয়া সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। অনেকটা সেইরূপ, প্রাণশক্তি কি তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ দ্বারা বুঝা না গেলেও উহার অস্তিত্ব, উহার প্রকৃতি, উহার ক্রিয়া, উহার সহিত শরীরযন্ত্রের সম্বন্ধ, রোগ বা শারীরিক বিকারের সহিত উহার সম্পর্ক, ঔষধের সহিত উহার সম্পর্ক প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণা একান্ত আবশ্যক। শুধু পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন (Physics এবং Chemistry) দ্বারা শরীরতত্ত্বের সকল সমস্যার সমাধান হইবে না। শরীরযন্ত্রের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহা ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রীর রাজ্যের বাহিরে। এই সূক্ষ্ম বিদেহী প্রাণশক্তিই সমগ্র শরীরযন্ত্রের ধারক, পালক ও পোষক।

দেহের যে কোন বিকার মূলতঃ এই প্রাণশক্তিরই বিকার সূচিত করে।

আমাদের শরীরে যে প্রাণ আছে, তাহা আমরা সকলেই জানি এবং প্রাণ না থাকিলে কি হয়, তাহাও জানি। সুতরাং প্রাণশক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করা বা ধারণা করা কঠিন নহে। এই প্রাণশক্তির সহিত জড়দেহের সম্পর্ক সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত যথোচিত গবেষণা হয় নাই। ফিজিক্স ও কেমিষ্ট্রী দিয়া দেহতত্ত্বের এই মৌলিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই, কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। শরীরের মধ্যে প্রাণশক্তির অস্তিত্ব এবং তাহার ক্রিয়ার অস্তিত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ম্যাকডুয়ালের 'ফিজিওলজি' (শতবার্ষিক সংস্করণ, ১৯৫০) পুস্তকের নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলি পাঠকবর্গ পড়িয়া দেখিতে পারেন:— পৃঃ, ২৩৫, লাইন ৩—৪; পৃঃ, ৩২৭, লাইন ১০—১১; পৃঃ, ৩৪৫, লাইন ৩৯—৪০; পৃঃ, ৩৫০, লাইন ১৭—২৯; পৃঃ, ৫২৫, লাইন ৬—৯। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সমস্তটুকু উদ্ধৃত করা সমীচীন হইবে না। এই সকল স্থানে vital process, vital action প্রভৃতি দ্বারা শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রাণশক্তিই সূচিত হইতেছে। পৃঃ ৩৪৫-এ স্পষ্টই আছে, "For example, glucose is more easily absorbed than lactose or xylose, although the latter has a smaller molecule. This is in direct conflict with physical laws and can only be explained as a result of vital action

on the part of the cell." সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন যে, শরীরের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে, যাহা ফিজিক্সকে গ্রাহ্য করে না। এই শক্তিটির গুণাবলী (properties) জানা আবশ্যক। এইগুলি সম্যক জানিতে পারিলে এবং রোগের সহিত ও ঔষধের সহিত ইহার সম্পর্ক যখন আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিব, তখনই চিকিৎসাশাস্ত্র প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে। তখন চিকিৎসা ভিতরের দিক হইতে বাহিরে আসিবে এবং ঔষধ প্রয়োগ প্রণালীও তদনুসারে পরিবর্তিত হইবে।

সুষ্ঠু চিকিৎসা করিতে হইলে শুধু রুগ্ন অবয়বটির চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া সমগ্র শরীরের চিকিৎসার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, একথাটাও বর্তমান যুগের প্রধান চিকিৎসা-বিশারদগণ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯৩৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারীর British Medical Journal বলিতেছেন,

"Far too little time and attention is devoted to the study of the individual, and the sick man is often forgotten in the study of the disease". ইত্যাদি। British Medical Association, Training of a Doctor সম্পর্কে Report-এ বলিতেছেন, 'It proposed a drastic overhaul which involves a different approach. The approach is based on the conception of disease as a disturbance in the structure and function of the organizm and regards simply as a descriptive convenience the concept of disease as clinical entities,' ইত্যাদি।

রোগ ও মনোবল

শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। অনেক সময়ে আমরা শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিকে সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাধি বলিয়া মনে করিয়া থাকি। যে রোগে মানসিক উপসর্গের প্রাবল্য বেশি, তাহাকে মানসিক বিকার বলা অন্যায় নহে। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, ঐসকল মানসিক বিকারের সহিত বিবিধ শারীরিক লক্ষণও জড়িত থাকে। হয়তো দেখা গেল, এক ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ অতীত ঘটনা স্মরণ করিলেই তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। এস্থলে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে হয়তো দেখা যাইবে যে, শুধু তাহার মানসিক বিকারই ঘটে নাই, তাহার শরীরে রক্ত-সঞ্চালন, উত্তাপ, পেশীর সম্প্রসারণ বা আকুঞ্চন, পাকযন্ত্রের বৈকল্য প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শারীরিক লক্ষণও প্রকাশ পাইয়াছে। শরীরের সহিত মনের সম্পর্ক অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। যেমন, কেহ ক্রোধোন্মত্ত হইলে তাহার রক্তচাপ বাড়িয়া যায়, মনে দুঃখ হইলে চক্ষু হইতে জল নির্গত হয়, মনে ভয় হইলে শরীরের বিভিন্ন পেশীগুলি কাঁপিতে থাকে। এইরূপ বহুপ্রকার ঘটনা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, মনের সহিত শরীরের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

একই ঘটনার ফলে সকল মানুষের মন সমান বিচলিত বা

বিকারগ্রস্ত হয় না। যেমন, কোন প্রিয়জনের মৃত্যুতে সকলেই ঠিক সমান বিচলিত হন না। যাঁহার মনের বল বেশি, তাঁহার চক্ষু দিয়া হয়তো জল বাহির হইবে না, আবার যাঁহার মন কোমল, তিনি কাঁদিয়া আকুল হইবেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রিয়জনমৃত্যুরূপ ঘটনাটিতে কাহারও অশ্রু বর্ষণ হয়, আবার কাহারও হয় না, যদিও দুঃখ উভয়েরই সমান।

আবার দেখা যায়, একই প্রকার শারীরিক বিকৃতিতে সকল মানুষের মানসিক বিকার সমান হয় না। কেহ এক শ' ডিগ্রি জ্বরে ভীত হইয়া পড়েন, আবার কেহ এক শ' তিন ডিগ্রি জ্বরেও বিচলিত হন না। কোন ভীতি-উৎপাদক ঘটনা ঘটিলে সকলেই সমান ভীতিগ্রস্ত হন না। ঠিক একই প্রকার শারীরিক আঘাত দুইজন ব্যক্তির মনে ঠিক সমপরিমাণ কষ্ট উৎপাদন করে না।

রোগের আক্রমণ সম্পর্কেও বহুলাংশে এইরূপ কথা খাটে। মানুষের শরীরে রোগপ্রতিষেধক শক্তি আছে। এই শক্তি সকলের সমান নহে। সেজন্যই একই অবস্থায় পড়িয়াও কেহ রোগাক্রান্ত হয় আবার কেহ রোগাক্রান্ত হয় না। এই প্রতিষেধক শক্তিরও দুইটি দিক আছে। একটি সম্পূর্ণ শারীরিক। শরীরের গঠন, স্বাস্থ্য, বয়স, পেশীবল, স্নায়ুবল প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এই শক্তি। আর একটি দিক হইতেছে মানসিক। মানসিক বলের সহিত রোগপ্রতিষেধের শক্তিরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সেইজন্যই বহুস্থলে দেখা যায়, শারীরিক বলের ন্যূনতা সত্ত্বেও মানসিক বলের প্রাধান্য হেতু রোগপ্রতিষেধক শক্তি বাড়িয়া যায়।

মনোবল যে শুধু সাধারণ রোগপ্রতিষেধের সহায়ক, তাহা নহে। অনেক সময়ে অনেক কঠিন সংক্রামক রোগও মানসিক বলের নিকট পরাজিত হয়। এই মনোবল সাধারণ স্বাভাবিক-ভাবেই জন্মিয়া থাকে। কষ্ট কল্পনা করিয়া এই বল অর্জন করা যায় না। সুতরাং মনোবল দ্বারা অনেক সময়ে সংক্রামক রোগ প্রতিহত হইলেও, এ কথা মনে করা অত্যন্ত ভুল হইবে যে, স্বাস্থ্যবিধি ও চিকিৎসাবিজ্ঞান অবহেলা করিয়া গোঁয়াতুর্মি করিয়া শুধু মনোবল সাহায্যে সংক্রামক বা অন্য ব্যাধির আক্রমণ প্রতিহত করা যাইতে পারে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, একই মানুষ এক সময়ে কঠিন রোগাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন, কিন্তু তিনিই হয়তো তদপেক্ষা মৃদুতর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন না। মনকে সর্বদা সুস্থ, সবল, নির্ভয় ও স্বাভাবিক রাখিতে পারিলে সংসারের অন্য দুঃখকষ্ট যেমন অপেক্ষাকৃত সহনীয় হয়, ঠিক তেমনি রোগপ্রতিষেধক শক্তির বৃদ্ধি হেতু অনেক কঠিন রোগও অনেক সময়ে প্রতিহত হইতে পারে।

এই বিষয়ে দুই-একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। বহুদিন পূর্বের কথা। তখন নড়াল কলেজে আই. এ. পড়ি। একদিন চিত্রানদীর বাঁধাঘাটে স্নান করিবার সময়ে দেখা গেল একটি কলেরা-আক্রান্ত রোগী লইয়া একটি নৌকা ঘাটে আসিয়া ভিড়িয়াছে। তাহার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমরা কয়েকজনে মিলিয়া উহাকে লইয়া কোলে করিয়া অর্ধ-সমাপ্ত একটি হোস্টেলের বাড়ির মধ্যে কোনমতে স্থান করিয়া দিয়া স্থানীয় ডাক্তার দ্বারা যথাসাধ্য

চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম। রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। তাহার বিকারগ্রস্ত মুখের অদ্ভুত আক্ষেপ, হিমশীতল সর্বাঙ্গে দরদর ঘাম, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিয়াছে। দুই-তিনজনে মিলিয়া তাহাকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়াও তাহার বিকারগ্রস্ত দেহকে স্থির রাখা যাইতেছে না। ইহার ঙ্গ পরিষ্কার র গায়ে কৌটা কৌটা বার্লি মাখান, প্রভৃতি সবই করা হইতেছে, কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। প্রায় পূর্ণ দুই দিন দুই রাত্রি বৃথা চেষ্টার পর রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইল। যে-কয়জন দিবারাত্র ইহার শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে কেহই কোনরূপ রোগাক্রান্ত হই নাই। আমাদের কাপড়ের খুঁটে একটু কর্পূর বাঁধিয়া রাখা ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থা ছিল না। এইরূপ রোগীর শুশ্রূষা যে বিপজ্জনক হইতে পারে, সে কথা মনেই আসে নাই।

আর একবার কলেজ হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে একটি রোগীর শুশ্রূষাকারীর অভাব হওয়ায় আমরা কয়েকজন মিলিয়া পালা করিয়া শুশ্রূষা করিতে গিয়াছিলাম। যতদূর মনে পড়ে, এই রোগীটি ছিলেন স্বর্গীয় অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট-জেনারেল কৃষ্ণলাল দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে। ইঁহার রোগের একটি বড় উপসর্গ ছিল কাশি এবং উহার সহিত রক্তপাত। অতিশয় দুর্বল। ঘাড় ফিরাইয়া পিকদানিতে কফ ফেলিতে কষ্ট হয়। স্পষ্ট মনে আছে, গভীর রাত্রে ইঁহার মাথার কাছে বসিয়া, রক্ত ও কফ তাঁহার ওষ্ঠের নিকট হইতে হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া পিকদানিতে ফেলিয়াছি। এখন অবশ্য মনে হয়, কাজটা ভাল

হয় নাই। যাহা হউক, ভগবানের আশীর্বাদে কোন বিপদ ঘটে নাই। যতদূর মনে পড়ে, আমাদের এই শুশ্রূষা-দলের মধ্যে অন্যান্য কয়েকজনের সহিত ছিলেন, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দত্ত (ইনি পরে একটি জমিদারের ম্যানেজার হইয়াছিলেন) এবং শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ ঘোষ, এম. এ. (বর্তমানে রানী ভবানী বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক)।

নড়ালের আর একটি কথা মনে পড়িতেছে। প্রায় এক বৎসর কাল আমার ঘরে একজন ছাত্র বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারও কাশির রোগ ছিল। কফের সহিত খুব রক্তও মেশানো থাকিত। অনেক দিন সকালে উঠিয়া দেখা যাইত, ইঁহার সারা রাত্রির কাশির ফলে ঘরের ইতস্তত বহুস্থানে রক্তমাখা কফ ছড়ানো রহিয়াছে। কাগজ ও নেকড়া ভিজাইয়া সেগুলিকে হাত দিয়া মুছিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিতাম। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়াছে, কখনও মনেই হয় নাই যে, ইহা বিপজ্জনক হইতে পারে। এখন এইসকল কথা স্মরণ করিয়া মনে হয়, কি গোঁয়ার্তুমিই করিয়াছি! ভগবান যেন নিজে আসিয়া আমার এই নির্বুদ্ধিতা ক্ষমা করিয়াছেন! উপরোক্ত স্থলে বাহ্যত রোগপ্রতিষেধের নিয়ম পালিত না হইলেও স্বাভাবিক সুস্থ মনই রোগ-প্রতিষেধের কার্য করিয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস।

পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই উক্তরূপ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া আমি মনে করি। তাঁহারাও একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, স্বাভাবিক, সুস্থ, নির্ভয় মন বহু স্থলে বহু রোগের

প্রতিষেধ করিয়াছে। তাই বলিয়া, যেখানে যতদূর সম্ভব, স্বাস্থ্যবিধিসম্মত ও বৈজ্ঞানিক উপায়েই রোগপ্রতিষেধের চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা কর্তব্য, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। প্রকৃতি দেবী অতি নির্মম। স্বাস্থ্যবিরোধী কার্য করিলে তিনি কাহাকেও ক্ষমা করেন না।

ডায়াবেটিস

বহুমূত্র নাম হইতেই বুঝা যায় যে, এই রোগের প্রধান লক্ষণ অতিরিক্ত পরিমাণে মূত্রত্যাগ।

এই ব্যাধি সাধারণত দুই প্রকারের হইয়া থাকে। এই দুই প্রকারের ব্যাধিকে মোটামুটি সরল ও জটিল বহুমূত্র রোগ বলা যাইতে পারে।

সরল বহুমূত্র রোগের প্রধান লক্ষণ বার বার মূত্রত্যাগ এবং অস্বাভাবিক তৃষ্ণা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এক পরিবারে পিতা বা মাতা বা নিকট আত্মীয়গণের কাহারও এই রোগ থাকিলে সে পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদেরও এই রোগ হয়। তবে এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। এই রোগের দৈহিক কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাদ্ভাগ অথবা মস্তিষ্কের থ্যালেমাস নামক অংশের নিম্নবর্তী অংশের রোগ বা বৈকল্য এই সরল বহুমূত্র রোগের মূল কারণ। উক্ত বৈকল্য অবশ্য বিবিধ কারণে ঘটিতে পারে। আঘাত, উপদংশ রোগ বা অন্য কোন কঠিন পীড়া হইতেও উপরি-উক্ত গ্রন্থি বা মস্তিষ্কের অংশবিশেষের রোগ জন্মিতে পারে।

সরল বহুমূত্র রোগে অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ এবং অতিরিক্ত পিপাসা—এই দুইটি লক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন গুরুতর লক্ষণ থাকে না। তবে এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই শরীরে নানাবিধ উপসর্গ আসিয়া

জুটিতে থাকে। রাত্রে বার বার উঠিতে হয় বলিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। রোগ পুরাতন হইলে সমস্ত শরীর দুর্বল হইতে থাকে। এই রোগের চিকিৎসা খুব কঠিন। অন্যান্য বিবিধ কঠিন রোগের ন্যায় এই রোগেরও প্রারম্ভকালেই সুচিকিৎসা হইলে সুফল পাওয়া যায়।

জটিল বহুমূত্র রোগ অতিশয় কঠিন ব্যাধি। সাধারণত আমরা যে সকল বহুমূত্র রোগী দেখি, তাহাদের প্রায় সকলেরই এই জটিল বহুমূত্র রোগ। এই রোগকে এখন হইতে আমরা শুধু বহুমূত্র রোগই বলিব।

এই বহুমূত্র রোগের প্রধান লক্ষণ রক্তে এবং প্রস্রাবে অতিরিক্ত পরিমাণ শর্করার আবির্ভাব। স্বাভাবিক রক্তেও কিছু পরিমাণ শর্করা থাকে। ১০০ কিউবিক সেন্টিমিটার রক্তে প্রায় ৯০ মিলিগ্রাম শর্করা থাকে। শর্করা-জাতীয় পদার্থ বা কার্বোহাইড্রেট-জাতীয় আহার্য গ্রহণ করিলে রক্তের শর্করাংশ বাড়িয়া যায়। কিন্তু স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির রক্তে এই শর্করা বেশিক্ষণ থাকে না। উহা সত্বরই শরীরের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। কিন্তু বহুমূত্র রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রক্ত আপনা-আপনি শর্করাশূন্য হয় না, অর্থাৎ শর্করা শরীরের অঙ্গীভূত হইয়া যায় না। ধমনীর রক্তে প্রতি ১০০ সি-সিতে প্রায় ১৮০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত শর্করা জমিলেও মূত্রে শর্করা থাকে না। কিন্তু এই সীমা ছাড়াইয়া গেলে মূত্রেও শর্করার আবির্ভাব হয়। এই সীমাকে রেনাল থ্রেসোল্ড বলে। এই সীমা মূত্রগ্রন্থির শক্তি ও অবস্থার উপর নির্ভর

করে। সেইজন্য এই সীমা সকল স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি বা সকল রোগীর পক্ষে সমান নয়। উপরে যে সংখ্যাগুলি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি মোটামুটি সংখ্যা। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে উহার তারতম্য হইতে পারে।

ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করিতে এবং তাহা শরীরের অঙ্গীভূত করিয়া লইবার জন্য পাকস্থলী হইতে, যকৃৎ হইতে, পিত্তস্থলী হইতে, প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি হইতে এবং অন্যান্য বিভিন্ন অংশ হইতে বহুপ্রকার রস নির্গত ও নিঃসৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শর্করাকে পরিপূর্ণরূপে অঙ্গীভূত করিতে প্যানক্রিয়াসের অন্তর্গত "লাঙ্গেরহান্সের দ্বীপ" (আইল্যাণ্ডস অব লাঙ্গেরহান্স) নামক অংশ হইতে নিঃসৃত রসই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। প্যানক্রিয়াসের আর একপ্রকার রস আছে। তাহা নির্গত হইয়া প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট্ দিয়া পিত্তরসের সহিত মিলিত হইয়া অন্ত্রের ডুয়োডেনাম অংশে গিয়া পড়ে। এই রসকে বহিঃনিঃসরণ বলা যাইতে পারে। উপরি-উক্ত দ্বীপ সমূহ হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহা সরাসরি রক্তের সহিত গিয়া মেশে। ইহাকে অন্তঃনিঃসরণ বলা যাইতে পারে। এবং উক্ত লাঙ্গেরহান্সের দ্বীপাবলীর নির্যাসকে ইনসুলিন বলা হইয়া থাকে। প্যানক্রিয়াসে এই দ্বীপাবলীর নিঃসরণের মাত্রা কোন কারণে কমিয়া গেলে বা ব্যাহত হইলে শর্করা পরিপূর্ণরূপে অঙ্গীভূত হয় না। সেইজন্য রক্তে অতিরিক্ত পরিমাণ শর্করা জমিয়া উঠে। এবং উহার পরিমাণ রেনাল থ্রেসোল্ড ছাড়াইয়া গেলে মূত্রেও শর্করার আবির্ভাব হয়। প্যানক্রিয়াসে

স্বাভাবিক ইনস্থলিনের অভাব ঘটিলে বাহির হইতে ইনস্থলিন সরবরাহ করিয়া সেই ক্ষতি পূরণ করা যায় এবং তদ্দ্বারা রক্তের শর্করাও কমিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শরীরের বাহিরে শর্করার উপরে ইনস্থলিনের কোন কার্য-কারিতা নাই।

জটিল বহুমূত্র রোগেও মূত্রের পরিমাণ বাড়ে এবং সেইজন্যই তৃষ্ণাও বাড়ে। কখনও কখনও এই রোগ এমনভাবে আক্রমণ করে যে, ইহার আক্রমণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। আবার অনেক সময় এই রোগ এমন ধীরগতিতে আক্রমণ করে যে, বহুদিন পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব বুঝাই যায় না। লক্ষণ ও উপসর্গগুলি যখন আরও প্রবল হইয়া উঠে, তখনই এ সম্বন্ধে রোগী সচেতন হন।

এই রোগ কাহার হইবে এবং কাহার হইবে না, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সাধারণত চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এই রোগ হইয়া থাকে। যাঁহারা কারবো-হাইড্রেট এবং শর্করা-জাতীয় খাদ্য বেশি খান, যাঁহাদের শরীরে অতিরিক্ত মেদ জন্মে, যাঁহাদের রক্তচাপ বেশি, যাঁহারা দৈহিক পরিশ্রম খুব কম করেন, যাঁহারা সমস্ত দিন বা অধিকাংশ সময়ে বসিয়া বসিয়া কাজ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই রোগ দ্বারা আক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবক এবং সর্বদা পরিশ্রমজনক কার্যে রত ব্যক্তিদিগেরও কখনও কখনও এই রোগ হইয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে বহুদিনব্যাপী মানসিক

দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ এই রোগের উৎপত্তির সহায়ক হইয়া থাকে।

এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে সকলেরই দৈনন্দিন অভ্যাস ও খাদ্য সম্বন্ধে সতর্কতা আবশ্যক। কারবো-হাইড্রেট-জাতীয় খাদ্য এবং শর্করা, অর্থাৎ ভাত, আটা, ময়দা, আলু প্রভৃতি এবং চিনি, গুড়, মিষ্টান্ন প্রভৃতি খুব কম খাওয়া আবশ্যক। প্রত্যহ কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করাও অত্যাবশ্যক। ইহাতে শরীরের খানিকটা শর্করা খরচ হইয়া যায়। আমাদের দেশের যে আর্থিক অবস্থা তাহাতে উক্ত খাদ্যগুলি বাদ দিয়া বা কম খাইয়া, তৎস্থলে মাছ, মাংস, ডিম, বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট ফল, প্রভৃতি খাওয়া অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সেইজন্য বহুমূত্র রোগীর উপযুক্ত পথ্য অনেকের ভাগ্যেই জোটে না। তথাপি কোন্ কোন্ খাদ্য ভাল এবং কোন্ কোন্ খাদ্য মন্দ, তাহা জানা থাকিলে যথাসম্ভব সতর্ক হওয়া যায়।

এই রোগ শরীরের সমগ্র অংশকেই অধিকার করিয়া থাকে। রোগের প্রবলতা অনুসারে শরীরের নানাস্থানে নানা-প্রকার আনুষঙ্গিক উপসর্গ বা রোগ জন্মিয়া থাকে। অনেক সময়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ফোঁড়া এবং কার্বাঙ্কল জন্মে। এগুলি সহজে সারিতে চায় না। কখনও কখনও এক-একটি অবয়বে কঠিন নালী-ঘা উৎপন্ন হয়। কখনও কখনও ফুসফুসের রোগ জন্মে, দুরারোগ্য ছানি জন্মে এবং সময়ে সময়ে বিবিধ প্রকার স্নায়বিক রোগ জন্মিয়া থাকে।

অনেক সময়ে এক প্রকার অজ্ঞানতা জন্মে, যাহাকে ডায়াবেটিস কোমা বলা হয়। এই লক্ষণটি অতীব ক্ষতিকর। অনেক সময়ে এই অজ্ঞানতাই মৃত্যুতে পরিসমাপ্ত হয়।

আমাদের দেশে এই রোগের প্রাতুর্ভাব খুব বেশি। হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী এবং অ্যালোপ্যাথি, সকলপ্রকার চিকিৎসারই বিবিধ ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির উপরে বর্ণিত খাদ্য ও অভ্যাস সম্বন্ধে সচেতন থাকা কর্তব্য এবং বৎসরে অন্তত একবার রক্ত, মূত্র এবং রক্তচাপ পরীক্ষা করা কর্তব্য। তা ছাড়া অতিরিক্ত পিপাসা, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ, সাধারণ তুর্বলতা, প্রভৃতি লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। রোগের সামান্য ইঙ্গিত পাইলেই তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করা কর্তব্য। বহু ক্ষেত্রেই দেখা যায়, রোগী বহু বৎসর যাবৎ এই রোগটিকে উপেক্ষা করিয়া জটিলতর করিয়া তুলিয়াছেন। তখন সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও রোগী রোগমুক্ত হইতে পারেন না। অনেক সময়ে রোগীকে আপাত-দৃষ্টিতে রুগ্ন বলিয়া মনে হয় না। এইজন্য বহুমূত্ররোগগ্রস্ত রোগীকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নোনাধরা মাটির কলসীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে এবং উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা হইলে রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হইলেও, তাহার জীবন বহু বৎসর দীর্ঘতর হইতে পারে।

ব্লাড-প্রেশার

প্রবন্ধের শিরোনামা ইংরাজীতেই লিখিলাম। কারণ, টেবিল, চেয়ারের মত ব্লাড-প্রেশার কথাটাও আমরা সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। এ কথাটার অর্থ রক্তের চাপ। একটি নলের ভিতর দিয়া যদি কোন তরল পদার্থের স্রোত বহিয়া যায়, তাহা হইলে সেই তরল পদার্থের সর্বত্রই একটি চাপ থাকে। নলটির যে কোন স্থান কাটিয়া দিয়া তথায় আঙুল বা হাত দিয়া স্রোত বন্ধ করিলেই এই চাপ অনুভূত হইবে। যদি একটি রবারের নলের ভিতর দিয়া কোন তরল পদার্থের স্রোত বহে, তাহা হইলে ঐ রবারের নল জোরে চাপিয়া ধরিয়া স্রোত বন্ধ করা যাইতে পারে এবং ঐ চাপের পরিমাণকেই মোটামুটিভাবে উক্ত তরল পদার্থের চাপ বলা যাইতে পারে।

আমাদের শরীরের সর্বত্র ধমনী (artery) এবং শিরার (vein) মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হইতেছে। হৃদ্‌যন্ত্র এই রক্ত সঞ্চালনের কেন্দ্রস্থল। হৃদ্‌যন্ত্র হইতে বৃহদ্ধমনীর (aorta) ভিতর দিয়া যে রক্ত সঞ্চালিত হয়, উহাই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া সমস্ত শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই রক্তপ্রবাহ একটি একটানা প্রবাহ নহে। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রমান্বয়ে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের ফলে এই প্রবাহও ক্রমান্বয়ে কম-বেশি হইয়া

থাকে। হাতের কব্জীর নিকট যে ধমনীটি টিপিয়া আমরা 'নাড়ী' দেখি (radial artery), তাহার দপ্‌দপ্‌ হইতেই বুঝা যায় যে, রক্তের গতি একেবারে একটানা নয়।

রক্তের চাপ নির্ণয় করিতে হইলে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাকে স্ফিগ্‌মোম্যানোমিটার বা স্ফিগ্‌মোমিটার বলে। ইহার চাপ-নির্দেশক অংশটি দুই প্রকারের হইয়া থাকে, অ্যানিরয়েড এবং মার্কারি-কলাম। প্রথমটি আকারে ছোট এবং ডাক্তারি ব্যাগের মধ্যে বহনের পক্ষে সুবিধাজনক। রক্তের চাপ মাপিতে হইলে একটি বাহুতে গরম জলের ব্যাগের মত একটি চৌকা রবারের ব্যাগ আঁট করিয়া জড়াইয়া লইয়া উহা হইতে একটি নল চাপমানযন্ত্রের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। আর একটি নলের অপর প্রান্তে একটি ভ্যাল্‌ভযুক্ত বাল্‌ব থাকে। ইহা বারবার টিপিয়া হাতে জড়ান রবারের ব্যাগের মধ্যে বাতাস ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এদিকে ষ্টেথোস্কোপটি কানে লাগাইয়া তাহার মুখটি কনুয়ের নীচে ব্রাকিয়াল ধমনীর উপর চাপিয়া ধরিয়া নাড়ীর স্পন্দন শোনা হয়। বাল্‌ব টিপিয়া বায়ুর চাপ বেশি করিয়া দিলে সেই চাপের ফলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। পরে বাল্‌বটির চাবি অল্প খুলিয়া বায়ুর চাপ কমাইতে থাকিলে এক সময়ে কানে পুনরায় স্পষ্ট লাব্‌-ডাপ্‌ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে চাপমানে যে চাপের পরিমাণ সূচিত হয় তাহাই সঙ্কোচ-চাপ (systolic pressure)। চাপ আরো কমাইতে কমাইতে যখন নাড়ীর স্পন্দন আর শোনা যায় না, ঠিক সেই সময়ে যে

চাপ সূচিত হয়, তাহাই সম্প্রসারণ-চাপ (diastolic pressure)। শরীরের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বা রুগ্ন (pathological) অবস্থার সহিত উক্ত দুই প্রকার চাপেরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তবে আমরা সর্বদা যে চাপের কথা উল্লেখ করি, যখন আমরা বলি উহার রক্তচাপ এত, তখন আমরা প্রথমোক্ত চাপের কথাই বলিয়া থাকি।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা রক্তচাপ বলিতে প্রথমোক্ত সঙ্কোচ-চাপই (systolic pressure) বুঝিব। রক্তের চাপ সকলের ঠিক সমান নয়। বয়স অনুসারে ইহার তারতম্য হয়। একই বয়সের বিভিন্ন ব্যক্তির রক্তচাপও সমান নয়। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, একজন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্কোচ-চাপ ১১০ হইতে ১৪০ একক হইয়া থাকে। এক মিলিমিটার দীর্ঘ একটি পারদস্তম্ভের যে চাপ তাহাকে এক একক ধরা হয়।

সুস্থ মানুষেরও রক্তের চাপ সকল অবস্থায় ঠিক সমান থাকে না শারীরিক পরিশ্রমে এবং মানসিক উত্তেজনায় রক্তচাপের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই বৃদ্ধি সাময়িক। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম করিলে এবং উত্তেজনা প্রশমিত হইলে রক্তচাপ আবার স্বাভাবিক হইয়া থাকে। এইপ্রকার সাময়িক চাপ-বৃদ্ধিকে রোগ বলা যায় না।

কিন্তু যদি কাহারও রক্তচাপ তাহার নিজেরই স্বাভাবিক চাপ অপেক্ষা বাড়িয়া আর না কমে বা বহুদিন ধরিয়া অব্যাহত থাকে তাহা হইলে এই অবস্থাকে রক্তচাপরোগ (High Blood Pressure বা Hypertension) বলা হয়। এই রক্ত-

চাপরোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার। রক্তসঞ্চালনের সহিত হৃদ্‌যন্ত্র এবং মূত্রগ্রন্থির (kidney) সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং হৃদ্‌যন্ত্র বা মূত্রগ্রন্থির কোন কঠিন পীড়া হইলে, রক্তস্রোতও অস্বাভাবিক হয় এবং তজ্জন্য কখনও কখনও রক্তচাপরোগ হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে রক্তচাপরোগটি হৃদ্-যন্ত্রাদির রোগের লক্ষণ বা পরিণতি। আর এক প্রকার রক্তচাপরোগে, হৃদ্‌যন্ত্র বা অন্য কোন যন্ত্র রোগাক্রান্ত না হইলেও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। ইহাকে মৌলিক রক্তচাপরোগ (essential hypertension) বলা হয়। অবশ্য হৃদ্‌যন্ত্রাদির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কহেতু এই মৌলিক রক্তচাপরোগ হইতেও পরে হৃদ্‌যন্ত্রাদির রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। তবে এখানে রক্তচাপই মৌলিক, হৃদ্‌যন্ত্রাদির পীড়া ইহার আনুষঙ্গিক।

আমরা সাধারণতঃ যে সকল রক্তচাপরোগ দেখিতে পাই, তাহা এই মৌলিক শ্রেণীর। এই রোগে সাধারণতঃ হৃদ্-যন্ত্রাদি অক্ষুণ্ণ থাকে, যদিও অনেক ক্ষেত্রে হৃদ্‌যন্ত্রাদির স্বাভাবিক ক্রিয়া বহুলাংশে ব্যাহত ও বিকৃত হইয়া থাকে। এই রোগের উৎপত্তির সঠিক কারণ নির্ণীত হয় নাই। রক্তবহা ধমনীগুলির কাঠিন্য, স্থিতিস্থাপকতাগুণের হ্রাস, উহার অভ্যন্তরভাগের আবরণের বিকৃতি প্রভৃতি কারণে রক্তচাপবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত অস্বাভাবিক অবস্থা কেন হয়, তাহা বলা কঠিন। যে কোন ব্যক্তির নিজের স্বাভাবিক রক্তচাপের পরিমাণ ৫ বা ১০ একক বৃদ্ধি পাইলে কোন আশঙ্কার কারণ নাই। তবে ১৬০-এর উপরে উঠিলে কিছু উদ্বেগের কারণ হইতে

পারে। ১৭০, ১৮০ বা তদূর্ধ্ব হইলে রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন।

রক্তচাপরোগের বৃদ্ধির অনেকগুলি বাহ্য কারণ আছে। অনেক সময়ে পিতামাতার উক্ত রোগ হইতে সন্তানের ঐ রোগ-প্রবণতা হইয়া থাকে। তবে আধুনিক জীবনযাত্রায় বিভিন্ন প্রকার মানসিক উদ্বেগ এই চাপবৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। সর্বদাই একটা ব্যস্ততা, একটা চাঞ্চল্য, একটা দুশ্চিন্তা, একটা ভয় বা উদ্বেগ প্রভৃতি মানসিক অবস্থা রক্তচাপবৃদ্ধির কারণ হইয়া থাকে। বর্তমান যুগে সকলেরই স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একটা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইজন্য এই রোগের প্রাদুর্ভাবও বেশী হইয়াছে।

এই রোগের প্রথম আবির্ভাব অনেক সময়েই ধরা পড়ে না। খুব অল্প অল্প করিয়া চাপ বাড়িতে থাকে এবং পরে যখন মাথাঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হওয়া, অনিদ্রা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকটিত হয়, তখনই সন্দেহ আসিয়া পড়ে। সাধারণ (benign) চাপরোগ ধীরে ধীরে বাড়ে। বহু বৎসর ধরিয়া শরীরে বিভিন্ন প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয়। বিষম (malignant) চাপরোগ অতি দ্রুত বর্ধিত হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই শরীর সম্পূর্ণ অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। সুখের বিষয়, বিষম রক্তচাপ রোগীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। প্রায় সব রোগীই সাধারণ চাপ-রোগী।

বর্তমানে আমাদের সকলেরই অবস্থা, কাঁধেতে জোয়াল,

রোদ বৃষ্টি নাই। সুতরাং নিরুদ্বেগ জীবন-যাপন অসম্ভব। তবে এই অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেও যথাসম্ভব মানসিক শান্তি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। অনেকে বিনা প্রয়োজনেও বিবিধ প্রকার উদ্বেগ এ উত্তেজনার কারণ ডাকিয়া আনিয়া থাকেন। তরুণ তরুণীর জীবনে হয়তো এমন একটা অবস্থা আসে, যখন মনে হয়, 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল', কিন্তু বয়স্কব্যক্তির পক্ষে 'এমন হৈ-হৈ আলো, মরি যদি সেও ভাল', একথা যুক্তিসহ নহে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বহুদিন পূর্বের কথা। একজন পদস্থ ব্যক্তি রক্তচাপ রোগে প্রায় শয্যাগত ছিলেন। সেই সময় একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আগমন ও তাঁহার অভ্যর্থনা ইত্যাদি উপলক্ষে চিকিৎসকের উপদেশ ও বারণ উপেক্ষা করিয়া তিনি অফিসে যান এবং অধিকতর অসুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করেন। ইনি অফিসে না গেলে উক্ত অভ্যাগত ব্যক্তির আদর অভ্যর্থনার কোনই ত্রুটি হইত না। আর একজন শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথা বলিতেছি। ইনি সময়মত তাঁহার পাপ্য ছুটি লইয়া বিশ্রাম ও পরে অবসর গ্রহণ না করিয়া কতকগুলি নিতান্ত অসার এবং অনর্থক কাজে জড়াইয়া পড়িয়া চাপবৃদ্ধি রোগ এমন বাড়াইয়া লইলেন যে, তাহার ফলে অল্পদিন পরেই তাঁহার দেহাবসান ঘটিল। এই হৈ চৈ-এর লোভটুকু সংবরণ করিলে তিনি দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া থাকিয়া স্বীয় পরিবারের

এবং সমাজের বহু কল্যাণসাধন করিতে পারিতেন। মানুষের জীবনে এবং সমাজের জীবনে হৈ চৈ-এর যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনি নীরব কর্ম ও নীরব সাধনারও সার্থকতা আছে।

অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের অনেকের ধারণা, অবদমিত ও অতৃপ্ত যৌন বাসনা রক্তচাপ রোগের একটি প্রধান কারণ। সভ্যসমাজে যথেচ্ছ যৌন-সম্ভোগের সুযোগ নাই। সেই জন্য মনকে যথাসম্ভব যৌন-উদ্দীপনা হইতে দূরে রাখাই সমীচীন। এই জন্যই অতীত কালে সংযমী ব্যক্তিরা লোকালয় হইতে দূরে থাকিতেন। লোকালয়ে বাস করিয়া, সর্বদা নারী সংস্পর্শে থাকিয়া, সিনেমা, থিয়েটার, নৃত্য, গীত উপভোগ করিয়া, শুধু যৌন কার্যটি হইতে বিরত থাকিলে মনের উপর ভয়ানক চাপ পড়ে এবং তাহাই অনেক ক্ষেত্রে রক্তচাপ উৎপাদন করে। গীতায় আছে—

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

এই মিথ্যাচার হইতে রক্তচাপ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে।

যাঁহাদের সামান্য রক্তচাপ দোষ আছে, তাঁহাদের হৈ-হৈ প্রিয়তা সর্বতোভাবে বর্জনীয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকত্ব, সভাপতিত্ব, প্রধান-অতিথিত্ব, বিবিধ প্রকার সভা-সমিতির সদস্যত্ব, প্রভৃতি অনাবশ্যক কাজ হইতে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। মানুষের কাজের প্রেরণা সাধারণতঃ তিনটি—অর্থ, যশ এবং

ধর্ম। যে সকল কার্যে ইহার কোনটিই নাই, তাহার জন্য জীবনপাত বাঞ্ছনীয় নয়। অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বহু রক্তচাপগ্রস্ত সভ্য আছেন, যাঁহাদের একমাত্র কর্তব্য, সন্ধ্যার সময়ে বন্ধ ঘরে জনতার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া একবার হাত তোলা বা না তোলা, ক্ষুধার্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর নিকট বলা, আমি অমুক মিটিং করিয়া আসিলাম এবং রক্ত-চাপ ২৫ একক বাড়াইয়া সারারাত্রি অনিদ্রায় ছট্‌ফট্ করা। সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর কাজের জন্য আত্মদানে মহিমা আছে। কিন্তু শুধু বাহ্য আড়ম্বরের জন্য আত্মহত্যা সমীচীন নহে।

বিশ্রাম, মিতাহার, সর্ববিষয়ে সংযম, উদ্বেগ ও উত্তেজনা পরিহার—এই কয়টি রক্তচাপরোগীর পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসকের কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন :—

'I would repeat that in the treatment of a case of essential hypertension the patient's manner of life is of the greatest consequence and its importance can scarcely be exaggerated.'

দাঁতের কথা

শিশুর যখন প্রথম দন্তোদগম হয়, তখন মাতাপিতার মনে কি আনন্দ! প্রথম যেদিন তাঁহারা লক্ষ্য করেন যে, শিশুর মাড়িতে একটি ক্ষুদ্র শসার বীচির মত এইটুকু একটি দাঁত বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন মনে হয় যেন কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই আনন্দ ক্ষণস্থায়ী হয়, কারণ প্রায়ই দেখা যায় শিশুর দন্তোদগমের সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় দেখা দেয় এবং অনেকগুলি দাঁত বাহির না হওয়া পর্যন্ত এই উদরাময় চলিতে থাকে। সাধারণতঃ ইহার জন্য বেশি উদ্বেগের কারণ নাই। ইহাকে ডেনটিশন ডায়ারিয়া বলে। তবে অত্যধিক মাত্রায় হইলে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হয়। এস্থলে একটি কথা স্মরণ রাখা বিশেষ কর্তব্য। অনেক সময় দেখা যায়, প্রসূতির অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ আছে। এস্থলে প্রসূতির চিকিৎসা শিশুর চিকিৎসা অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। প্রসূতি নিরাময় না হইলে এবং অসুস্থ প্রসূতির স্তন্যপান করিলে শিশু সুস্থ থাকিতে পারে না।

আমরা সকলেই জানি আমাদের বত্রিশটি করিয়া দাঁত আছে। দৈবাৎ ইহা হইতে ব্যতিক্রম হয়। প্রতি পাটিতে ষোলটি দাঁত। এক পাটির বাঁদিকে এবং ডানদিকে ঠিক একভাবে সাজানো দুইটি সারিতে আটটি করিয়া দাঁত।

প্রতি পাটির এক পাশের পাঁচটি দাঁত, অর্থাৎ মোট কুড়িটি দাঁত, একবার পড়িয়া গিয়া আবার ওঠে। বাকি প্রতি সারির তিনটি, অর্থাৎ মোট বারটি দাঁত একবার ওঠে।

এক পাটির এক সারির দাঁতগুলি মোটর উপর এইরূপ :
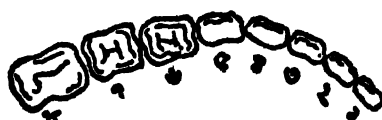
কেহ হাঁ করিলে নীচের পাটির ডানদিকে তাকাইলে আটটি দাঁতের মাথা এইরূপ দেখাইবে। এই দাঁতগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে।

১ ও ২—কর্তনী (incisors)
৩—কুকুরে দাঁত (canine)
৪—প্রথম প্রি-মোলার (first pre-molar)
৫—দ্বিতীয় প্রি-মোলার (second pre-molar)
৬, ৭ ও ৮—মাড়ির দাঁত (molar)

উপরের ও নীচের দুই পাটির চার সারির দাঁতগুলি এইরূপ। যে দাঁতগুলি দুইবার ওঠে তাহাদের মধ্যে কোনটি কোন সময়ে প্রথমে ওঠে তাহা মোটামুটি নিম্নের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে :—

নীচের পাটির (১, ১)—ছয় মাসের পর হইতে।
উপরের (১, ১)—আট মাসের পর হইতে।

নীচের (২, ২) ও (৬, ৬)—পনর মাসের পর হইতে।
উপরের ঐ ঐ
উপরের ও নীচের (৩, ৩)—ষোল মাসের পর হইতে।
উপরের ও নীচের (৭, ৭)—কুড়ি মাসের পর হইতে।

উপরোক্ত দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়া আবার ওঠে। বাকি দাঁতগুলি একবার ওঠে। স্থায়ী দাঁতগুলি কখন কোনটি ওঠে তাহা নীচের তালিকা হইতে মোটামুটিভাবে বুঝা যাইবে :—

প্রত্যেক সারির (৬)—ষষ্ঠ বৎসরে
" (১)—সপ্তম বৎসরে
" (২)—অষ্টম বৎসরে
" (৪)—নবম বৎসরে
" (৫)—দশম বৎসরে
" (৩)—দশ বৎসরের পর
" (৭)—এগার বৎসরের পর
" (৮)—সতের বৎসরের পর

এগুলি সবই একটা মোটামুটি হিসাব। কার্যত ইহার বহু ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিরূপে এই সকল দাঁতের সৃষ্টি হয় এবং উদ্গম হয়, তাহা এখনও রহস্যাবৃত।

এক একটি দাঁতের তিনটি অংশ। প্রথম অংশ শীর্ষ (crown), যেটা মাড়ির উপরে দেখা যায়। দ্বিতীয় অংশ মূল (root), যেটা নীচে চোয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তৃতীয় অংশটি এই দুই অংশের মাঝখানে। এটাকে দাঁতের গলদেশ

(neck) বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক দাঁতের অভ্যন্তরে একটি নরম পদার্থ থাকে, তাহাকে দাঁতের শাঁস (pulp) বলা হয়। ইহার বহির্ভাগে যে বৃহৎ অংশ তাহাকে ডেন্টিন (dentine) বলে; শীর্ষদেশের নিকটের ডেন্টিন ঢাকা থাকে এক প্রকার শক্ত শাদা চকচকে পদার্থে। ইহাকে এনামেল (enamel) বলে।

দাঁতগুলি আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের যাঁতার মত। আমাদের খাদ্য ভাল করিয়া থেতলাইয়া উহাকে পরিপাকের পক্ষে সহজতর করিয়া দেওয়াই ইহার প্রধান কর্তব্য। ইহা ছাড়া অন্য গৌণ কর্তব্যও মাঝে মাঝে ইহাদিগকে করিতে হয়, যেমন দাঁত-খিঁচানো, সহসা লজ্জিত হইলে জিভ্ কাটা ইত্যাদি।

দাঁতগুলিকে এবং দাঁতের ফাঁকগুলিকে সর্বদা খুব পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। উহার মধ্যে খাদ্যকণা ঢুকিয়া বেশিক্ষণ থাকিলে তাহা পচিয়া রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আহারের পরই খুব ভাল করিয়া চার পাঁচবার কুলকুচি করা এবং সকালে (সম্ভব হইলে বৈকালেও) একবার করিয়া দাঁতন বা ব্রাশ দ্বারা ভাল করিয়া পরিষ্কার করা কর্তব্য। আহারের পরই ব্রাশ প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কার করিলে আরো ভাল হয়, তবে ইহা হয়তো অনেকের রুচিতে বাধিবে।

দাঁতের সহিত পাকস্থলীর এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। দাঁত বা মাড়ি খারাপ হইলে, অর্থাৎ মাড়িতে বা দাঁতে রোগ হইলে, সেই রোগের জীবাণু পাকস্থলীতে গিয়া বিবিধ রোগের সৃষ্টি করে। তেমনি খাদ্যের মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি-এর অভাব

ঘটিলে তাহা হইতে দাঁতে পোকা ধরা প্রভৃতি রোগ হইতে পারে। এই জন্য শিশুদের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণে চুণের জল উপকারী। যে সকল পদার্থে ভিটামিন ডি আছে (যেমন, গোদুগ্ধ, মাখন, ডিমের কুসুম প্রভৃতি) সেই সকল পদার্থ দাঁতের পক্ষে উপকারী।

কাচে যেমন এক প্রকার ময়লা পড়ে, যাহা সহজে ওঠে না, অনেক সময়ে চাঁচিয়া তুলিতে হয়, তেমনি দাঁতেও এক প্রকার শক্ত ময়লা (tartar) জমে। এগুলিকে চিকিৎসকের সাহায্যে পরিষ্কার করা কর্তব্য। তবে এইরূপ পরিষ্কার করিতে গিয়া বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে, যেন এই পরিষ্কার করার ফলে দাঁতের এনামেল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। দাঁত যদি একটু কম চকচকে ঝকঝকে হয়, সেও বরং ভাল, তবু কোন মতেই এনামেল নষ্ট করা কর্তব্য নয়। এনামেল একবার খারাপ হইয়া গেলে সহজে তাহার পূরণ হয় না। বয়স বেশি হইলে শুধু ভাল দেখাইবার জন্য দাঁতের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করাই সমীচীন।

কোন না কোন দন্তরোগে ভুগিতেছেন, এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা অল্প নহে। অথচ অতি সাধারণ এবং সহজ দুই একটি নিয়মিত অভ্যাসের দ্বারাই দাঁত খুব ভাল রাখা যাইতে পারে। কাঁকর চিবানো বা অনুরূপ কোন আকস্মিক কারণ বাদ দিলে, অন্য যে সকল কারণে দাঁত খারাপ হয়, তাহার প্রতিকার কঠিন নহে। দাঁত পরিষ্কার রাখাই দন্তরোগ নিবারণের মুখ্য উপায়। আমরা ঘরবাড়ী, দরজা-জানালা প্রভৃতি পরিষ্কার

করিবার জন্য যেটুকু মনোযোগ দেই, তাহার অতি ক্ষুদ্রাংশ দাঁতের জন্য দিলে, দাঁতের অসুখ হইতে পারে না। অতি সহজ ও সাধারণ নিয়মিত অভ্যাসের ফলেই দেখা যায় অনেক বৃদ্ধের দাঁত মোটামুটিভাবে বেশ সুস্থ আছে। অবশ্য বৃদ্ধ বয়সে, শুধু বয়সের জন্যই স্বাভাবিকভাবে দাঁত পড়িয়া যাইবেই, ইহা কেহ রোধ করিতে পারিবেন না। তবে দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্মটা একটু সময়ে বুঝিলে অনেক কষ্ট এবং অনেক রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দাঁতের কোন প্রকার উপসর্গ হইলেই উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া একান্ত কর্তব্য এবং যে কারণে দাঁতের রোগ জন্মিয়াছে, সেই কারণেরও প্রতিকার কর্তব্য। শুধু সাধারণভাবে দাঁত পরিষ্কার রাখার ফলে, এমন অনেক বৃদ্ধ আছেন, যাঁহারা অনায়াসে কাঁচা আম বা বরফের টুকরা চিবাইয়া খাইতে পারেন এবং কোন অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া আস্ত আখ দাঁত দিয়া ছাড়াইয়া এবং চিবাইয়া খাইতে পারেন।

একজেমা

ত্বক বা চর্ম শরীরের সমস্ত অংশেরই বহিরাবরণ। কোন কোন স্থলে ইহা শক্ত এবং স্থূল, যেমন হাতের পাতায় বা পায়ের তলায়। আবার কোন কোন স্থলে ইহা খুব কোমল এবং পাতলা, যেমন চোখের পাতায়। চর্মের গঠন এবং উপাদান অতীব জটিল। ইহার পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় দেওয়া যায় না। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, ইহার দুইটি স্তর আছে। উপরের স্তর বা বহিঃস্তর (Epidermis) এবং তাহার নীচে প্রকৃত চর্ম (Dermis বা Cutis Vera)। তাহার নীচে আছে চর্বির একটা স্তর এবং তাহারই সহিত সংযুক্ত মাংস। বহিঃস্তরের বহির্দিকে একটা শুষ্ক স্তর আছে এবং তন্নিম্নে একটি কোমল স্তর আছে। এই শুষ্ক স্তরটি ক্রমাগত শুকাইয়া পড়িয়া যাইতেছে এবং নিম্নস্থ কোমল স্তরের কোষ (Cell)-গুলি আবার তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে। বহিঃস্তরের নিম্নের প্রকৃত স্তরে অসংখ্য রক্তবাহিকা (blood-vessels) এবং স্নায়ু (nerves) আছে। এগুলির দ্বারাই এই অংশের রক্ত চলাচল হয় এবং ঠাণ্ডা, গরম, বেদনা প্রভৃতি অনুভূতি হইয়া থাকে। চর্ম শরীরেরই একটি বিশিষ্ট অংশ। উহা হইতে পৃথক নহে। আমাদের শরীর হইতে অনাবশ্যক জল নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা আছে, চর্মও তাহার

অন্তর্গত। চর্মের অসংখ্য ছিদ্র হইতে নিঃসৃত ঘর্ম শরীরের একটি অবাঞ্ছিত পদার্থরূপে (মল-মূত্রাদির ন্যায়) শরীর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণও চর্মের একটি প্রধান কার্য। রোম এবং নখও চর্মের সহিতই সংশ্লিষ্ট।

চর্মের বিবিধ প্রকার রোগ হইতে পারে। তন্মধ্যে কতক-গুলি রোগ নিতান্ত বাহ্য কারণে হইয়া থাকে। যেমন, দাড়ি কামাইতে গিয়া খানিক চর্ম কাটিয়া গেল, বা চর্মের কোন স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ছিঁড়িয়া গেল, বা কোন অংশ আগুনে পুড়িয়া গেল। এই প্রকার বাহ্য কারণ জনিত ক্ষতি ব্যতীত অন্য যে সকল রোগকে আমরা চর্মরোগ বলি, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে চর্মেরই রোগ নহে, আভ্যন্তরীণ অন্য কোন রোগের বহিঃপ্রকাশ। মনে করুন, দেখা গেল, গাত্রের চর্ম অস্বাভাবিক-রূপে উষ্ণ হইয়াছে, হয়তো ১০৩° বা ১০৪° উষ্ণ। এই ত্বক শীতল করিবার জন্য বরফ জলে সর্বাঙ্গ ডুবাইয়া রাখা যাইতে পারে। তাহাতে উষ্ণ ত্বক শীতল হইবার খুবই সম্ভাবনা। কিন্তু তাহার অন্যান্য ফল কিরূপ ভয়ানক হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এখানে চর্মের উষ্ণতা শুধু চর্মেরই রোগ নহে, আভ্যন্তরীণ অন্য রোগের একটি লক্ষণ। সুতরাং যে কোন প্রকারে চর্মটিকে শীতল করিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। আমরা অনেক সময়ে দেখিয়াছি, শিশুদের হাম হইলে, হামের গুটিকা ভালরূপে চর্মের উপর নির্গত না হইলে, অত্যন্ত বিপদের আশঙ্কা হইয়া থাকে। এখানেও হামের গুটিকা চর্মের রোগ নহে, আভ্যন্তরীণ রোগের বহিঃ

প্রকাশ। রোগটি যেন হামরূপেই চর্মের ভিতর দিয়া মুক্তি লাভ করিতে চায়। কোন কারণে তাহাতে বাধা পাইলে ঐ আভ্যন্তরীণ রোগ শরীরের অন্য সূক্ষ্মতর যন্ত্রগুলি (যেমন, ফুস্‌ফুস্) আক্রমণ করিয়া গুরুতর ফল প্রসব করিতে পারে। হামকে চর্মরোগ মনে করিয়া চর্মটিকে কোনমতে হামশূন্য করিবার চেষ্টা কেহই করেন না। তাহাতে হিতে বিপরীত হইতে পারে। একটি উপমা দেওয়া যাইতে পারে। মানুষ যখন শোকার্ত হইয়া ক্রন্দন করে, তখন বুঝিতে হইবে তাহার আভ্যন্তরীণ শোকই চক্ষুর জলদ্বারা কিঞ্চিৎ প্রশমনের চেষ্টা করিতেছে। এখানে চক্ষু হইতে প্রচুর জল-নির্গমন চক্ষুর কোন রোগের জন্য নহে, অন্তর্নিহিত শোক-রোগের একটি মুক্তি-প্রচেষ্টা। সুতরাং কোনমতে চক্ষুর জল নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই শোক প্রশমিত হইবে না। বরং অবাধে কিছুক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করিতে দেওয়াই এস্থলে সমীচীন।

একথাগুলি খুব সহজ হইলেও, কার্যত আমরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি। চর্মের বহু প্রকার রোগের মধ্যে একজেমা (Eczema) একটি অতি সাধারণ রোগ। এই একজেমার বহু প্রকারভেদ আছে। শরীরের যে কোন স্থানেই এই রোগ হইতে পারে। তবে পায়ের বিভিন্ন স্থানেই ইহার প্রাদুর্ভাব সর্বাপেক্ষা বেশি। এতদ্ব্যতীত মাথায়, কানের পাশে, পিঠে, হাতে, জঙ্ঘায়ও হইয়া থাকে। একজেমা অসুখটি সাধারণ হইলেও ইহার চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন। একজেমার চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে যে এটি শুধু

চর্মেরই রোগ নহে। হাম প্রভৃতির মত আভ্যন্তরীণ অন্য কোন গভীর রোগই ইহার মূল কারণ। যকৃতের রোগ, পাকস্থলীর রোগ, অন্ত্রের রোগ, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বহু কারণে একজেমা হইতে পারে। সেই সকল কারণ দূরীভূত না হইলে একজেমা স্থায়ীরূপে সারে না। Price-এর পুস্তকে আছে, Those cases in which some underlying susceptibility exists are always apt to be resistant to treatment. এই underlying susceptibility সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আবশ্যক। রোগীর অতীত জীবনের এবং রোগের ইতিহাস, তাহার শরীরের বিভিন্ন অংশের রোগাদির বিবরণ, রোগের হ্রাস-বৃদ্ধির সময় প্রভৃতি ধীরভাবে এবং গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রাণশক্তির কি বিপর্যয় ঘটিয়াছে এবং মৌলিক রোগটি কি, তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রাণশক্তির মৌলিক বিপর্যয়কে অনেক সময়ে মূলরোগ (Miasm) বলা হইয়া থাকে। এই মৌলিক রোগ বহুদিনের বহু পুরাতন রোগের কারণ হইতে পারে, এবং এই মৌলিক miasm-ই Price-বর্ণিত উক্ত underlying susceptibility এর কারণ হইতে পারে। এই মৌলিক রোগ নির্ণয় করিতে পারিলে এবং তদনুসারে চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে সুফল পাইবার সম্ভাবনা অধিকতর হয়। সম্প্রতি ডাঃ রবার্টসন এমন অনেকগুলি রোগীও দেখিয়াছেন, যাহাদের একজেমা মানসিক অবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কয়েকক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, কোন অতি গুরুতর মানসিক অশান্তির সময়েই একজেমা

বাড়িয়া গিয়াছে, আবার মানসিক শান্তি খানিকটা ফিরিয়া আসিলেই একজেমাও আপনা-আপনি কমিয়া গিয়াছে।

উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, বাহ্য ঔষধ প্রয়োগে একজেমা সারিবার আশা করা যায় না। আভ্যন্তরীণ মৌলিক রোগ নির্ণয় করিয়া তাহারই চিকিৎসা করিতে হইবে। তবে রুগ্ন স্থান পরিষ্কার রাখিবার জন্য নারিকেল তৈল বা ঐরূপ কিছু ব্যবহার করা যাইতে পারে। জল ও সাবান দিয়া কখনই একজেমা ধৌত করা কর্তব্য নয়। জল সর্বদাই একজেমার পক্ষে অপকারী। আহার্যের মধ্যে মাদকদ্রব্য, মাংস, গরম মশলা এবং সাধারণতঃ রোগীর পক্ষে দুষ্পাচ্য আহার নিষিদ্ধ।

বিভিন্ন প্রকার বিষাক্তদ্রব্য মিশ্রিত বাহ্য প্রলেপাদি ব্যবহারে অসুখ তো সারেই না, বরং বিবিধ প্রকার বিষ ন্যূনাধিক পরিমাণে চর্মের রক্তবাহিকার ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ ক্ষতি করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, বিবিধ প্রকার মলমাদি দ্বারা একজেমা দাবাইয়া রাখার (Suppress) চেষ্টা করিলে, শরীরে অন্য গুরুতর রোগের আবির্ভাব হইতে পারে। একজেমা, শোকার্ত ব্যক্তির চোখের জলের মত, অন্তর্নিহিত কোন গভীর রোগের আত্মপ্রশমনের একটা পথ। সেই পথ বলপ্রয়োগে নিরুদ্ধ হইলে, সেই অন্তর্নিহিত গভীর রোগ অন্য পথে প্রচলিত হয়। বিপর্যস্ত প্রাণশক্তি আত্ম-প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টায় অন্য অঙ্গের দিকে প্রধাবিত হয়। এই জন্যই দেখা গিয়াছে, বলপূর্বক একজেমা সারাইতে গিয়া দারুণ হাঁপানি রোগ দেখা দিয়াছে। আবার হাঁপানি সারাইতে

গিয়া পুনরায় একজেমা আবির্ভূত হইয়াছে। বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগের ফলে রুগ্ন অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছে, এরূপ উদাহরণও আছে। এই সকল কারণে একজেমার জন্য কোন বাহ্য প্রলেপাদি ব্যবহার সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং অনেক সময়ে হানিকর।

হাঁপানি

যে-কোন প্রকার শ্বাসকষ্টের নামই হাঁপানি। এই সকল হাঁপানির কারণও বহুপ্রকারের। একটি সুস্থ সবল বালক যদি অনেকখানি দৌড়াইয়া আসে, তাহা হইলে সে হাঁপাইতে থাকে। ইহাও একপ্রকার হাঁপানি। কিন্তু ইহা রোগ নহে। সাময়িক কারণে এই শ্বাসকষ্টকে সাধারণত আমরা হাঁপানি বলি না। বিবিধ কারণে এই কষ্টের উদ্ভব হইয়া থাকে।

এই রোগের কারণ নির্ণয় করা সহজ নহে। অনেক সময়ে দেখা যায়, পরিবারস্থ কাহারও এই রোগ থাকিলে, তাঁহার সন্তানসন্ততি এবং নিকট-আত্মীয়গণেরও এই রোগ জন্মে। মোটের উপর শ্বাসনালী এবং তৎসংক্রান্ত বিভিন্ন অবয়বের কোন বিশেষ প্রকার বৈকল্যই যে ইহার কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও কি কারণে উক্ত বৈকল্য ঘটে, তাহা সঠিকভাবে অবধারণ করা যায় না।

অনেক সময়ে দেখা যায়, অন্যান্য অসুখের ফলে দেহ-যন্ত্রের নানাপ্রকার বৈকল্যের সঙ্গে হাঁপানিও দেখা দেয়। বাত, উপদংশ, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ প্রবল হইলে অনেক সময়ে হাঁপানির উদ্ভব হয়। হাঁপানি রোগের সূত্রপাত অন্য নানা কারণেও হইতে পারে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বা স্যাঁৎসেঁতে বাড়িতে বাসের ফলে কাহারও কাহারও হাঁপানির উদ্ভব হয়।

যাঁহাদের হাঁপানি আছে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেরই একপ্রকার জলবায়ু বা আবহাওয়া সমান সহ্য হয় না। যে আবহাওয়ায় যিনি ভাল থাকেন, সেইরূপ আবহাওয়াতেই তাঁহার বাস করা কর্তব্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, গুরুপাক আহার বা তজ্জনিত পরিপাকের ব্যাঘাত হইতে শ্বাসকষ্টের উদ্ভব হয়। এসকল ক্ষেত্রে আহারাদি সম্পর্কে সতর্ক হইলে উপসর্গের উপশম হইয়া থাকে। অনেক সময়ে হাঁপানির আক্রমণের মূলে রোগীর কোনপ্রকার একটি স্নায়বিক দুর্বলতা বা খেয়াল পরিদৃষ্ট হয়। কোন কোন বিশেষ গন্ধ কোন কোন রোগীর শ্বাসকষ্টের কারণ হইতে পারে।

শ্বাস-নালী এবং তাহার শাখা-প্রশাখা কোনপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইলে তাহা হইতে শ্বাসকষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সেইজন্য যাঁহারা পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে ভোগেন, তাঁহাদের অনেকেই কালক্রমে হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। এই প্রকারের রোগীর সংখ্যা খুব বেশী। ইহারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে যখন কিছু শক্ত কাশি বাহির হইয়া যায় তখন একটু উপশম বোধ করেন। এই কষ্টলাঘব সকলের সমান সময়ে হয় না। কাহারও দুই-এক ঘণ্টা এই শ্বাসকষ্ট থাকে, আবার কাহারও সারাদিন-রাত্রিও থাকিতে পারে। পৌনঃপুনিক আক্রমণ এই রোগের একটি প্রধান্ লক্ষণ। এই রোগ রাত্রিতে, বিশেষত শেষরাত্রিতে প্রবল হয়। তবে এ বিষয়ে ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। অনেকে দিনেও খুব কষ্ট পাইয়া থাকেন।

যদি অন্য কোন কঠিন ব্যাধি হইতে ক্রমশ এই হাঁপানি রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই রোগের চিকিৎসা করিলে, তৎসঙ্গে হাঁপানিরও উপশম হইতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হৃদ্‌যন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেইজন্য হৃদ্‌যন্ত্রের বিবিধ রোগ হইতেও হাঁপানি উৎপন্ন হইতে পারে। এইরূপ রোগকে হৃদ্‌যন্ত্র-সম্পর্কিত (কার্ডিয়াক) হাঁপানি বলা যায়। এই রোগে হৃদ্‌যন্ত্রের চিকিৎসাই মূল চিকিৎসা।

হাঁপানি রোগ বাত-বহুমূত্রাদির ন্যায় দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া থাকে। দশ, পনর, এমনকি ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরও চলিতে পারে। এই কারণে সাধারণত একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে। লোকে মনে করে হাঁপানি রোগই দীর্ঘ আয়ুর কারণ। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। কোন রোগই আয়ুবৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিতে চাই। অনেকক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, অজীর্ণ (ডিস্‌পেপসিয়া) রোগীরা দীর্ঘায়ু হইয়াছেন। ইহার কারণ অজীর্ণ রোগ নহে। ইহার কারণ এই যে, এই সকল রোগীর মধ্যে অনেকে বাধ্য হইয়া আহারাদি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতা ও নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং তাহারই ফলে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহারা ক্রমশ বিবিধ প্রকার কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘায়ু হইতে পারেন না।

হাঁপানি রোগ যে-কোন বয়সেই হইতে পারে, যদিও বেশি বয়সেই ইহার আক্রমণাশঙ্কা বেশি। এই রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, ইহা হইতে নানাপ্রকার গুরুতর উপসর্গের সৃষ্টি হইতে

পারে। এই রোগ হইতেই কঠিন হৃদ্‌রোগের সৃষ্টি হইতে পারে এবং ক্রমশ শোথ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকটিত হইতে পারে।

হাঁপানি রোগের সামান্য আভাস পাইবামাত্র অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। শ্বাসকষ্ট একান্ত অসহনীয় হইলে সাময়িক কষ্টলাঘবের জন্য কোন জোরালো ঔষধ খাওয়া অনিবার্য হইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ ঔষধে রোগের প্রকৃত প্রতিকার হয় না। যেমন, অসহনীয় মাথা ধরা জোরালো দুই-একটি বড়ি খাইলেই সারিয়া যায়, কিন্তু উহাতে মাথাধরা রোগের কোন উপকার হয় না। হাঁপানি রোগের চিকিৎসা কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ। প্রকৃতপক্ষে যে কোন দীর্ঘকালব্যাপী রোগের চিকিৎসাই বহু সময়সাপেক্ষ।

যাঁহাদের হাঁপানি রোগ আছে অথবা এই রোগের প্রতি প্রবণতা আছে তাঁহাদিগের পক্ষে সুচিকিৎসা ব্যতীত কয়েকটি সাধারণ নিয়ম পালনও অবশ্যকর্তব্য। এই নিয়মগুলি শুধু হাঁপানির জন্যই নহে, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেও প্রয়োজনীয়। প্রথমত, ভিজা বা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে বা বাড়িতে বাস করা কর্তব্য নয়। কলিকাতার অধিকাংশ বাড়ির একতলা হাঁপানি রোগীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। দ্বিতীয়ত, বদ্ধ বাতাসে বাস বা শয়ন করা কর্তব্য নয়। জানালা খুলিয়া শোওয়াই বিধেয়। তৃতীয়ত, যাহাতে সর্দি-কাশি না হয়, তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। এ বিষয়ে সকলের পক্ষে এক নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কি কি অবস্থায়, বা কি কি করিলে সর্দি-কাশি হয় বা বাড়ে, তাহা মনে রাখিয়া প্রত্যেককে তদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিতে

হইবে। চতুর্থত, যাহাতে পেট গরম হয়, অম্ল জন্মে, উদ্গার হয়, পেটে বায়ু জন্মে, এরূপ আহার বর্জনীয়। রাত্রে কদাচ গুরু আহার কর্তব্য নয়। পঞ্চমত, ধূলি ও ধূমপরিপূর্ণ বাতাসে কখনও থাকা কর্তব্য নয়। ষষ্ঠত, গাড়ির পশ্চাতে যে ধূম নির্গত হয়, তাহা হইতে সর্বদা দূরে থাকিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। সপ্তমত, জীবজন্তুর গায়ের গন্ধ হইতেও দূরে থাকা কর্তব্য। অন্যান্য বিবিধ কঠিন রোগের ন্যায়, এই রোগেও শুধু সুচিকিৎসাই যথেষ্ট নয়, সংযম ও সতর্কতাও একান্ত আবশ্যক।

পেটে ব্যথা

বিভিন্ন প্রকার পেটের ব্যথায় কষ্ট পাইতেছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা কম নহে। কাহারও ব্যথা পেটের উপরের দিকে, কাহারও নিচের দিকে, কাহারও বাম দিকে, কাহারও ডান দিকে, কাহারও ব্যথা সর্বক্ষণ থাকে, কাহারও ব্যথা মাঝে মাঝে ওঠে, কাহারও অল্প অল্প ব্যথা, কাহারও ব্যথা অসহ্য; এইরূপ বিবিধ প্রকার ব্যথার বিবিধ কারণ থাকে। এই সকল ব্যথার সহিত অন্যান্য উপসর্গও অনেক সময় জড়িত থাকে, যেমন—জ্বর, বমনোদ্বেগ, বুকজ্বালা, পেটফাঁপা, অম্লোদগার প্রভৃতি। এই সকল বিবিধ প্রকার পেটব্যথার কারণ অনুসন্ধান এবং সুষ্ঠু চিকিৎসা অতীব কঠিন।

পেটের উপরদিকে একটু ডানদিকে একপ্রকার বেদনা হয়, তাহার কারণ যকৃতের দোষ অথবা পিত্তস্থলী (Gall bladder) কিংবা পিত্তনালীর রোগ। যকৃতের দোষের জন্য যে বেদনা, তাহার চিকিৎসা যকৃতেরই চিকিৎসা। পিত্তস্থলীতে বিভিন্ন আকারের পাথর জন্মিয়া ঐ পাথরগুলি পিত্তস্থলীর গায়ে লাগে এবং কখনও কখনও পিত্তনালীর পিত্তরস নিঃসরণে বাধা দেয়। ইহাতে বেদনার উদ্ভব হয়। এই রোগকে অনেক সময়ে পিত্তপাথুরী বলা হইয়া থাকে। এই অসুখ কেন হয়, তাহা এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। পাথর জন্মিয়াছে কিনা,

তাহা এক্স-রে সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কখনও অস্ত্রোপচার দ্বারা এবং কখনও শুধু ঔষধ সেবন দ্বারাই এই রোগের চিকিৎসা করা হইয়া থাকে।

পেটের উপরদিকে একটু বামপাশে যে বেদনা হয়, তাহার কারণ সাধারণত পাকস্থলীর প্রদাহ বা পাকস্থলীর ক্ষত। পাকস্থলীর ভিতরদিকের আবরণে খাদ্যগ্রহণের অনিয়মের দোষে অনেক সময়ে স্থানে স্থানে প্রদাহ হয়। সেই সময়ে বেদনা অনুভূত হয়। অত্যধিক অম্লরস সঞ্চয় এবং শূন্য পাকস্থলীতে বিবিধ তীব্র পাচকরসের নিঃসরণে এইরূপ প্রদাহ হইতে পারে। পাকস্থলী এবং অন্ত্র একেবারে খালি করিয়া বেশি সময় রাখা যায় না এবং তাহাতে ইচ্ছামত ঔষধাদি প্রয়োগ করা যায় না। সর্বদাই খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন অবস্থায় পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ভিতর দিয়া যাইতেছে। সেইজন্য শরীরের বাহিরে কোথাও প্রদাহ হইলে যেরূপ চিকিৎসা প্রয়োগ করা হয়, তাহা শরীরের অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা যায় না। পাকস্থলীর কোন স্থানের প্রদাহ বহুদিন ধরিয়া থাকিলে তাহা ক্রমশঃ ক্ষতে পরিণত হয় এবং তখন চিকিৎসা আরও কঠিন হইয়া পড়ে। কখনও কখনও পাকস্থলীতে ছিদ্র পর্যন্ত হইয়া যায়।

অনেক সময়ে দেখা যায় আহারের তিন-চার ঘণ্টা পরে পেটে বেদনা আরম্ভ হয়। খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌঁছিবার পর তিন ঘণ্টা বা চার ঘণ্টা পরে খানিকটা পরিপাক হইয়া, উহা ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশে (duodenum) গিয়া পৌঁছে।

সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে, ডুয়োডেনামের কোন স্থানের প্রদাহ বা ক্ষতের জন্যই উক্ত বেদনা হইতেছে।

ক্ষুদ্রান্ত্রটি বহু দীর্ঘ এবং শেষদিকে বৃহদন্ত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সংযোগস্থলে সিকাম নামক একটি বাটির মতো অংশ আছে এবং ইহার নীচেই একটি লম্বা আঙুলের মত অ্যাপেনডিক্স। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের দিকের আবরণের গায়েও প্রদাহ বা ক্ষত হইতে পারে এবং সেজন্যও বেদনা অনুভূত হইতে পারে। অ্যাপেনডিক্স একটি অদ্ভুত অঙ্গ। ইহা একটি বদ্ধমুখ থলির মতো। আহার্যদ্রব্য বা মল কোন প্রকারে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না। এই খাদ্য বা মল পচিয়া অ্যাপেনডিক্সে প্রদাহ সৃষ্টি করে। ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য না হইলে অস্ত্রোপচার করিয়া এই অঙ্গটিকে একেবারে কাটিয়া ফেলাই সঙ্গত।

পেটে বেদনা অনুভবের সাধারণ কয়েকটি কারণ দেওয়া হইল। এখানে দীর্ঘদিনস্থায়ী কষ্টকর বেদনার কথাই বলা হইতেছে। সামান্য আহারের অনিয়মে যে সকল পেটের গোলমাল হয় এবং একদিন বা দুই দিনের মধ্যেই সারিয়া যায়, সেগুলি এখানে বিবেচ্য নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি, পেটের অভ্যন্তরস্থ যে-কোন অঙ্গের চিকিৎসা অতীব কঠিন। এই জন্য যাহাতে এই সকল রোগ না জন্মে তাহার জন্য সকলেরই সাবধান হওয়া কর্তব্য। পেটের যে সকল স্থানে বেদনার কথা বলা হইল, সে সকল স্থানে খাদ্য (পাচিত বা অপাচিত) ব্যতীত আর কিছুই যায় না। সুতরাং

খাদ্যই যে ঐ সকল রোগের কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং খাদ্য সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক হইলে উক্ত রোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এমন কোন জিনিস বেশি পরিমাণে থাকা উচিত নয়, যাহা দুষ্পাচ্য, তীব্র বা প্রদাহজনক। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আহার করা কর্তব্য। নতুবা পাকস্থলীর বিভিন্ন প্রকার পাচকরসের এবং পিত্তরসের নিঃসরণের সময় ও পরিমাণ অনিয়মিত এবং বিপর্যস্ত হইয়া যায়। পেটের বেদনা প্রভৃতি বহুরোগের মূলে রহিয়াছে অনিয়মিত সময়ে খাদ্যগ্রহণ। কোনদিন নয়টায় কোনদিন একটায় মাধ্যাহ্নিক আহার গ্রহণ অতীব মারাত্মক।

অল্প পরিমাণে বিষ খাইলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। সুতরাং অনিবার্য কারণে অল্প পরিমাণে অখাদ্য গ্রহণ করিলে গুরুতর কুফল হয় না। ভগবান আমাদের পরিপাক-যন্ত্রগুলিকে এমন কষ্টসহ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন যে, সহজে ইহার রোগ হয় না। কিন্তু আমরা এতই অসংযত যে, পরিপাক যন্ত্রগুলির এই সুদৃঢ়তার সুযোগ লইয়া ক্রমাগত অত্যাচারের পর অত্যাচার করিয়া ইহাকে রোগগ্রস্ত করিয়া তুলি। আমরা সাধারণতঃ যে সকল আহার্য দ্রব্যে অভ্যস্ত, যেমন—ডাল, ভাত, মাছ, মাংস, তরকারি, দুধ ইত্যাদি—এগুলির কোনটিই আমাদের পক্ষে অপকারী নয়। নিয়মিত সময়ে এবং নিয়মিত পরিমাণে এগুলি খাইলে পেটের কোন অসুখ করিতে পারে

না। কোন্ খাওয়া সহ্য হইতেছে এবং কোন্ খাওয়া সহ্য হইতেছে না তাহা একটু বিবেচনা করিলে প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন এবং তদনুসারে কোন কোন খাদ্য বর্জন করিয়া চলিতে পারেন। মানুষের শরীর মোটামুটি এক প্রকারের হইলেও পিতামাতার স্বাস্থ্য, বাহিরের আবহাওয়া, বহুদিন অর্জিত অভ্যাস প্রভৃতি বিবিধ ব্যক্তিগত কারণে বিবিধ খাদ্য বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে হানিকর হইতে পারে। ইহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। খাদ্য সম্বন্ধে যাঁহারা একটু সতর্ক, তাঁহাদের পেটের ব্যাধি খুব কম হয়। অতিরিক্ত চা-পান বহুবিধ কঠিন উদর-রোগের কারণ। অথচ চা না খাইলে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না।

পেটের ব্যথার রোগীদের অমার্জনীয় অপরাধ এই যে, রোগের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার চিকিৎসা করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমে বলেন, এই দু'তিন মাস থেকে ব্যথা। কিন্তু একটু জেরা করিলেই জানা যায়, হয়তো দশ-বার বৎসর বা তারও বেশি দিন হইতে ভুগিতেছেন। প্রথম দিকে কোন চিকিৎসাই করেন নাই। নিজের বা আর কাহারও পরামর্শ মতো কখনও একটু 'খাবার সোডা', কখনও একটু জোয়ানের আরক, কখনও ঔষধের দোকান হইতে কোন একটা হজমী বড়ি, গুঁড়া বা আরক খাইয়া বেদনার সাময়িক উপশম হইতে না হইতেই পুনরায় পূর্ববৎ আহারের অনিয়ম ও অত্যাচার চালাইয়াছেন। তারপর বেদনা আর একটু বাড়িলে গরম জলের ব্যাগ, বিবিধ পাঁচ মিনিটে বেদনানাশক ঔষধ ব্যবহার

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তখনও আহারাদি পূর্ববৎ চলিতেছে। আরও কয়েক বৎসর পরে যখন মরফিয়া ব্যতীত বেদনার উপশম হয় না এবং নিছক বেদনার জন্যই সাধারণ আহারাদিও অসম্ভব হইয়া উঠে, তখন চিকিৎসকের কাছে আসিয়াছেন। রোগের আরম্ভের বহু বৎসর পরে ক্ষত উৎপন্ন হয়। যখনই প্রথম কোন অস্বাভাবিক বেদনা অনুভূত হয় তখনই অথবা অন্ততঃ তাহার পাঁচ ছয় মাস পর পর্যন্তও চিকিৎসকের পরামর্শ লইয়া ঔষধ সেবন করিলে এবং আহারে সংযত হইলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কঠিন রোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করা যায়।

কোন ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করিয়া বাসা বাঁধিলে, যতই দিন যাইবে ততই উহার প্রকোপ বাড়িবে এবং ততই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের এবং অগণিত টিস্যু (tissue) এবং সেলের (cell) বিবিধ ক্ষতিসাধন করিবে। রোগের চিকিৎসার অর্থ এই ক্ষতি নিবারণ করা। শরীর যত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, উহার চিকিৎসায়ও ততই বেশি সময় লাগিবে। পেটের কোন কঠিন অসুখই (কলেরা টাইফয়েড প্রভৃতি কতকগুলি তরুণ অসুখ ব্যতীত) অল্পদিনে হয় না। বহুদিনের অবহেলা, বহুদিনের অচিকিৎসা, বহুদিনের অসংযমের ফলে ইহা হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার সুচিকিৎসাও সময়সাপেক্ষ। অনেক রোগী আশা করেন যে, যে রোগীটিকে দশ পনের বা বিশ বৎসর ধরিয়া পুষিয়াছেন, সেটি দুই-এক দিন বা দু-এক মাসেই

সম্পূর্ণ সারিয়া যাইবে। ইহা কখনও সম্ভব নয়, বিশেষত যেখানে অস্ত্রোপচার না করিয়া শুধু ঔষধ সেবনের দ্বারাই অসুখের নিরাময়লাভের আশা করা যায়। আমি পুনরায় এ কথা সকলকেই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই, যে-কোন রোগেরই প্রথম অবস্থাতেই মূলোৎপাটনে যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

মাথা ধরা

মাথাধরা একটি অতি সাধারণ রোগ। এমন লোক আছেন কি না সন্দেহ, যাঁহার কখনও না কখনও মাথা ধরে নাই। আমাদের যে একটা করিয়া মাথা আছে এবং তাহার মধ্যে ঘিলু নামক খানিকটা পদার্থ আছে, তাহা আমরা জানিতে পারি, যখন আমাদের মাথা ধরে। এই মাথাধরা ব্যাপারটি খুব সাধারণ হইলেও, ইহার প্রকৃতি একপ্রকার নহে। মাথা-ধরা বহু প্রকারের হইয়া থাকে। কাহারও মাথার দুই পাশের 'রগ' দপ্‌দপ্‌ করে, কাহারও মাথার বাঁদিকে জ্বালা করে, কাহারও মাথার পিছনের দিকে বেদনা অনুভূত হয়, কাহারও মাথার ঠিক মধ্যস্থলে একটা সাধারণ বেদনা হয়, কাহারও মাথার মাঝখানে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয়, কাহারও মাথার একটি বিশেষ স্থানে বা একটি বিন্দুতে বেদনা কেন্দ্রীভূত হয়, কাহারও মনে হয় মাথার মধ্যে কট্‌কট্‌ করিতেছে, কাহারও মনে হয় ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, কাহারও মনে হয় মাথাটি ঘুরিতেছে, কাহারও মনে হয় মাথার মধ্যে মস্তিষ্কপিণ্ডটি নড়িতেছে, কাহারও মনে হয় মাথাটি বুঝি ফাটিয়া যাইবে, কাহারও মনে হয় মাথার একপাশে যেন পেরেক ঠোকা হইতেছে, কাহারও মনে হয় মাথার তালুটা কেহ চাপিয়া ধরিয়াছে, কাহারও মনে হয় মাথাটা যেন একটা শক্ত ফিতা

দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে, কাহারও মনে হয় মাথার তালুতে দপ্ দপ্ করিতেছে, কাহারও কপাল টন্ টন্ করে, কাহারও নাকের গোড়া পর্যন্ত ব্যথা হয়, কাহারও কানের ভিতর পর্যন্ত বেদনা বিস্তৃত হয়, কাহারও দাঁতের গোড়া হইতে মাথার ভিতর পর্যন্ত একটানা ব্যথা হয়, কাহারও শুধু বাঁদিকের রগের কাছটাতেই বেদনা হয়, কাহারও শুধু ডানদিকের রগের পাশেই ব্যথা হয় (এগুলিকে সাধারণতঃ আধকপালে মাথা ধরা বা Hemicrania বলে), কাহারও ঠাণ্ডা লাগিলে মাথা ধরে, কাহারও রৌদ্র লাগিলে মাথা ধরে, কাহারও বেশি গোলমালে মাথা ধরে, কাহারও বদ্ধঘরে মাথা ধরে, কাহারও ক্ষুধা লাগিলে মাথা ধরে, কাহারও রাত্রি জাগিলে মাথা ধরে, কাহারও বেশি পড়াশুনা করিলে মাথা ধরে, কাহারও মাথায় বাতাস দিলে ভাল থাকে, কাহারও মাথায় কম্ফর্টার না বাঁধিলে চলে না, কাহারও সকালের দিকে মাথা ধরে, কাহারও সন্ধ্যার দিকে, কাহারও সকালে মাথা ধরিয়া বেলা বাড়ার সঙ্গে মাথাধরা বাড়িতে থাকে, আবার বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাথাধরাও কমিয়া আসে, কাহারও দিনের একটি নিয়মিত সময়ে মাথা ধরে, কাহারও কয়েকদিন অন্তর অন্তর নিয়মিত মাথা ধরে, কাহারও মাথাধরা আপনা-আপনিই কমিয়া যায়, কাহারও ঔষধ না খাইলে কমে না, কাহারও মাথা ধরিলে শুইয়া থাকিতে হয়, কাহারও শুইলে অস্বস্তি বাড়ে, ইত্যাদি। মাথাধরার রূপ এত বিভিন্ন যে ইহার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

সাধারণভাবে এই সকল মাথাধরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমতঃ সাময়িক তরুণ মাথাধরা।

দ্বিতীয়তঃ, অন্য কোন রোগজনিত মাথাধরা; যেমন—জ্বর বেশি হইলে সাধারণতঃ তাহার সহিত মাথাধরা থাকে। এস্থলে মাথাধরাটা জ্বরেরই আনুসঙ্গিক উপসর্গ।

তৃতীয়তঃ, পুরাতন বা ক্রনিক মাথাধরা। এই মাথাধরার সাক্ষাৎ কারণ সব সময় নির্ণয় করা সহজ নহে। কখনও কখনও এই ধরণের মাথাধরা অন্য কোন এক ক্রনিক অসুখের লক্ষণরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ঐরূপ অন্য কোন রোগ আবিষ্কার করা যায় না, বা আবিষ্কার করা অতি কঠিন।

আমরা যে সকল মাথাধরার রোগী দেখিতে পাই, তাহারা প্রায় সকলেই এই তৃতীয় শ্রেণীর। প্রথম দুই শ্রেণীর মাথা-ধরাকে সাধারণতঃ মাথাধরা রোগ বলিয়া গণ্য করা হয় না।

প্রথম শ্রেণীর মাথাধরার চিকিৎসা কঠিন নহে। অনেক সময় ঔষধ ব্যতীতও উহা সারিয়া যায়। হয়তো কাহারও রৌদ্র লাগানর ফলে মাথা ধরিয়াছে। এস্থলে ছায়ায় বিশ্রাম, হাত-মুখ ঠাণ্ডা জলে ধোওয়া এবং পাখার বাতাসেই এ মাথাধরা সারিয়া যাইতে পারে। যদি স্বাভাবিক চেষ্টায় না সারে, বা মাথাধরা খুব কষ্টদায়ক হয়, তখন ঔষধের প্রয়োজন হইতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাথাধরার চিকিৎসা, যে রোগের লক্ষণরূপে

উহা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই রোগের চিকিৎসার সঙ্গেই হইবে। কখনও কখনও মাথাধরার জন্য পৃথক ঔষধ প্রয়োজনই হইবে না। আবার কখনও কখনও হয়ত উহার জন্যও ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণীর মাথাধরাই সর্বাপেক্ষা কঠিন। ইহার সহিত ঠিক অন্য কি কারণ জড়িত আছে, তাহা নির্ণয় করিতে দীর্ঘ দিন যাবৎ রোগীকে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। তাহার শরীরে কবে কোন রোগ হইয়াছে, কিরূপে তাহা সারিয়াছে, অথবা না সারিয়া থাকিলে তাহার বর্তমান অবস্থা কিরূপ, সেই অসুখের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত এই মাথাধরার সম্পর্ক আছে কি না, তাহা অতি সাবধানে নির্ণয় করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানের ফলে হয়তো নাকের সহিত, কানের সহিত, চক্ষুর সহিত, পাকস্থলীর সহিত, হৃদযন্ত্রের সহিত, জরায়ুর সহিত বা শরীরের অন্য কোন অবয়বের সহিত একটা দূর বা নিকট, স্থায়ী বা ক্ষণস্থায়ী সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে। যদি এইরূপ কোন সম্পর্ক পাওয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসা একটু সহজ হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু মাথাধরা রোগীর পক্ষে এইরূপ সম্পর্ক পাওয়া যায় না। তখন শুধু মাথাধরারই চিকিৎসা করিতে হয়। এই ধরণের অসুখকে কখনও কখনও একদেশী অসুখ বলে। এস্থলে মাথাধরার প্রকৃতি, লক্ষণ, হ্রাসবৃদ্ধির সময় এবং অন্যান্য অবস্থা প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়।

মাথাধরার ঔষধ মোটামুটি দুই প্রকার। এক প্রকার

ঔষধ আছে, তাহাতে মাথাধরার (বা যে কোন প্রকার বেদনার) অনুভূতি নষ্ট করিয়া দেয়। এইরূপ কোন কোন ঔষধে অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। এইরূপ ঔষধ অধিকাংশই স্বভাবতই অতি তীব্র। পুনঃপুনঃ এইরূপ ঔষধ ব্যবহারে স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হইতে পারে।

আর এক প্রকার চিকিৎসা হইতেছে মাথাধরার লক্ষণাদি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া সমগ্র মানুষটির প্রকৃতি, স্বাস্থ্যগত বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস, বয়স, প্রভৃতি সম্যকরূপে ও বিশদরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়া এমন ঔষধ এমনভাবে প্রয়োগ করা, যাহাতে রোগীর নিজস্ব বিশেষ প্রকারের মাথাধরার স্থায়ী উপশম হয়। এই কারণেই মাথাধরা ব্যাধিটা অতি সাধারণ হইলেও, ইহার চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন।

দেহাভ্যন্তরস্থ কয়েকটি সংখ্যা

বিশুদ্ধ গণিতে π, e, প্রভৃতি কতকগুলি ধ্রুব সংখ্যা বা স্থিরাঙ্ক (constant) আছে। ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতিতেও সেরূপ বহু স্থিরাঙ্ক আছে। যেমন, স্থিতি-স্থাপক-অঙ্ক, অ্যাভোগ্যাড্রোর সংখ্যা, প্লাঙ্ক-স্থিরাঙ্ক ইত্যাদি। আমাদের শরীরের মধ্যেও অনেকগুলি স্থিরাঙ্ক আছে। এইগুলির কতক নিরপেক্ষভাবে স্থির (absolute constant), আবার কতকগুলি প্রায় স্থির, অর্থাৎ তাহাদের মান মোটামুটি স্থির হইলেও বয়স, স্বাস্থ্য, রোগ প্রভৃতি বিবিধ কারণে পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এখানে শরীরাভ্যন্তরস্থ যে সকল সংখ্যার উল্লেখ করিতেছি, সেগুলি সাধারণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য।

আমাদের শরীরের অস্থি-র সংখ্যা ২০৬। ইহার মধ্যে বাহু হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত এক এক হাতে ৩০টি, উরু হইতে অঙ্গুলি পর্যন্ত এক এক পায়ে ৩০টি, মেরুদণ্ডে ২৬টি এবং মাথার খুলিতে ৮টি হাড় আছে।

আমাদের দাঁতের সংখ্যা—৩২।

আমাদের মাস্‌ল্‌-এ (যাহাকে সাধারণতঃ আমরা মাংসপেশী বলি) আছে—জল ৭৫%, প্রোটিড ২০%, স্নেহ ২%, নাইট্রোজেন-জাত পদার্থ ১% এবং পটাস্‌, ফস্‌ফরাস ও কার্বন জাত লবণ ২%।

হৃৎপিণ্ডের আকার—৫ ইঞ্চি × ৩½ ইঞ্চি × ২½ ইঞ্চি;

ওজন ১০ আউন্স। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মিনিটে—৭২। শ্বাস-প্রশ্বাস মিনিটে—১৮।

৬০°F তাপে রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব—১·০৫৫ হইতে ১·০৬২। রক্তের সাধারণ তাপ—১০০°F (চর্মের উপরে ৯৮°)।

দেহের রক্তের মোট পরিমাণ—দেহের ওজনের $\frac{১}{১১}$ হইতে $\frac{১}{১৪}$।

১ ঘন মিলিমিটারে লাল রক্তকণিকার সংখ্যা—৫০০০০০০; স্ত্রীলোকের দেহে ৪৫০০০০০। শ্বেত রক্তকণিকা—প্রতি ঘন-মিলিমিটারে ৫০০০ হইতে ১০০০০।

রক্তের চাপ—সঙ্কোচন (systolic) ১০৫ হইতে ১৫০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ। সম্প্রসারণ (diastolic)—৭০ হইতে ৯০ মি. মি., পা. স্তম্ভ।

শিরার ভিতর দিয়া রক্তের গতি—সেকেণ্ডে এক মিটার।

রক্তের H-ion concentration অতি স্বল্প, তিন কোটি কুড়ি লক্ষ লিটারে মাত্র এক গ্র্যামআয়ন। H-ion concentration যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দ্বারা সূচিত হয়, তাহা দশের একটি ঋণাত্মক ঘাত (Negative power of ten)। এই ঘাতটিকে *pH* বলে। শারীরবিদ্যায় এই *pH* একটি অত্যা-বশ্যক স্থিরাঙ্ক। স্বাভাবিক রক্তের *pH* হইতেছে ৭·৪। জলের *pH* হইতেছে ৭।

আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি (নিশ্বাসে)—মিনিটে ৩০০ ঘনসেণ্টিমিটার। কার্বন ডাইঅক্সাইড খরচ হয়—মিনিটে ২০০ ঘনসেণ্টিমিটার।

যদি ক = প্রতি মিনিটে নাড়ীস্পন্দনের সংখ্যা, খ = প্রতি স্পন্দনের সর্বোচ্চ রক্ত চাপ এবং গ = ব্যবহৃত অক্সিজেনের পরিমাণ হয়, তাহা হইলে $\frac{\text{ক} \times \text{খ}}{\text{গ}}$ = স্থিরাঙ্ক (constant)।

যে উচ্চতায় মানুষ স্বাভাবিকভাবে বাঁচিতে পারে, তাহার সর্বোচ্চ মান ২০,০০০ ফুট।

এক কিলোগ্র্যাম জলের তাপ ১৬°C হইতে ১৭°C পর্যন্ত বাড়াইতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে ক্যালোরি বলে। সাধারণতঃ একজন মানুষের নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিতে দৈনিক যত ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন তাহার পরিমাণ—১৭০০। বাহিরের কর্মব্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে এই সংখ্যা—৩৫০০। সাধারণতঃ মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·০১০ হইতে ১·০৩০। ইহার *pH*, ৭ হইতে ৫·৫।

কয়েক ঘণ্টা খালি পেটে থাকিবার পর সুস্থ ব্যক্তির রক্তের মধ্যে প্রতি ১০০ ঘনসেণ্টিমিটারে ৮০ হইতে ১২০ মিলিগ্র্যাম গ্লুকোজ থাকে। কার্বোহাইড্রেটযুক্ত আহার্যগ্রহণে ইহা বাড়িয়া ১৫০ বা ১৬০ মিলিগ্র্যাম হইতে পারে। কয়েক ঘণ্টা পরে কার্বোহাইড্রেট জাত গ্লুকোজ দেহের অঙ্গীভূত হইবার পর রক্তের শর্করা স্বাভাবিক হইয়া যায়।

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় দ্রব্যের সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হওয়াকে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম বলে। বহুমূত্র রোগে এই শক্তি ব্যাহত হয়। এই জন্য বহুমূত্র রোগে রক্তের শর্করার পরিমাণ বাড়িয়া ৬০০ মিলিগ্র্যাম পর্যন্ত হইতে পারে।

যে পরিমাণ গ্লুকোজ এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে তদ্দ্বারা তাহার গ্লুকোজ-সহনশীলতার মান বুঝিতে পারা যায়। অতিরিক্ত পরিমাণে গ্লুকোজ গ্রহণ করিলে রক্তে গ্লুকোজের অংশ বাড়িতে থাকে এবং ক্রমশঃ একটি সীমায় গিয়া পৌঁছায়। এই সীমা অতিক্রম করিলে মূত্রেও শর্করা দেখা দিতে পারে। এই সীমাকে রেনাল থ্রেসোল্ড বলে। এই সীমা সাধারণতঃ ১৮০ মিলিগ্র্যাম (১০০ ঘনসেণ্টিমিটারে)।

সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির বুকের মাপ, প্রশ্বাসের শেষে ৩৪ ইঞ্চি এবং নিশ্বাসের শেষে ৩৬ ইঞ্চি। এই দুই ইঞ্চি সম্প্রসারণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

একজন ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তি যদি d ফুট দূর হইতে একটি অক্ষর পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায় এবং একজন সুস্থ ব্যক্তি যদি ঐ অক্ষরটিকে D ফুট দূর হইতে পরিষ্কার দেখিতে পায়, তাহা হইলে উপরিউক্ত ক্ষীণদৃষ্টি ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির (visual acuity) পরিমাণ $\frac{d}{D}$.

পুরুষ মানুষের মাথার চুলের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ, স্ত্রীলোকের প্রায় সওয়া লক্ষ।

উপরে যে সকল সংখ্যা দেওয়া হইল—বয়স, স্বাস্থ্য, ওজন, দেশ, কাল প্রভৃতি ভেদে ঐ গুলির অল্পবিস্তর তারতম্য হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তির পক্ষে উক্ত সংখ্যাসমূহ অতিরিক্ত পরিমাণে কম বা বেশী হইলে, তাহা কোন রোগের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

পানাসক্তি

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে মানুষের জীবন যাপনের বিভিন্ন প্রকার রীতি ও নীতি প্রচলিত। এক দেশে বা এক সমাজে যাহা নিন্দিত, অন্য সমাজে হয়তো তাহাই প্রশংসিত। কোন সমাজে আমিষ ভক্ষণ অতি উপাদেয় মনে হয়, আবার কোন সমাজে উহা অতীব গর্হিত কার্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কোন সমাজে বাল্য-বিবাহ অতি প্রশস্ত, আবার কোন সমাজে উহা অত্যন্ত নিন্দার্হ। বিবিধ বিষয়ে এইরূপ পার্থক্য সত্ত্বেও কতকগুলি বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে কোথাও মতানৈক্য নাই। মানব-সভ্যতার আদিম যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সর্ব দেশে, সর্ব কালে, সর্ব সমাজে কতকগুলি কার্য একান্ত নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল দোষের মধ্যে একটি দোষ হইতেছে পানাসক্তি। অন্যান্য বহু দোষের ন্যায় এই দোষটিও সর্ব সমাজেই ন্যূনাধিক পরিমাণে বর্তমান। বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে এই দোষের প্রসারতা দেখিয়া অনেকেই চিন্তিত হইয়াছেন। এই সর্বনাশা অভ্যাস ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না। ইহা সমগ্র জাতির প্রাণশক্তি, সংস্কৃতি ও আদর্শবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। ইহার গুরুত্ব চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিবেন এবং

এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বর্তমান কালে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মানুষের সকল প্রকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের মূল তাহার মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কে যে বিভিন্ন স্নায়ুকেন্দ্র আছে, তাহা হইতেই ভিতরের ও বাহিরের সর্ব প্রকার কার্য ও অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। মানবেতর জীবেরও মস্তিষ্ক আছে এবং তাহার মধ্যেও স্নায়ুকেন্দ্র আছে। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা এবং কার্য অতি সীমাবদ্ধ। দর্শন, স্পর্শন প্রভৃতি বিবিধ অনুভূতি বর্তমান থাকিলেও, মানুষের মত সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা তাহাদের নাই। যে সকল স্নায়ুকেন্দ্রের প্রভাবে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি জাগ্রত হয়, সেগুলিকে 'হায়আর সেণ্টার্স্' (higher centres) বলে। সেগুলি সাধারণতঃ মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে অবস্থিত। এই জন্য সাধারণ ধারণা এই যে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের (যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের) কপালের দিকটা অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এইরূপ উচ্চতা বর্তমান থাকুক বা নাই থাকুক, মোটের উপর মানুষের মস্তিষ্কের ভিতর লজ্জা, ঘৃণা, দয়া, মমত্ববোধ, সদসদ্‌বিচার, অতীতস্মৃতি, ন্যায়-অন্যায়-বোধ, কর্তব্যজ্ঞান, কল্পনা, অনুসন্ধিৎসা, সৌন্দর্যবোধ, শিল্পচাতুর্য, কবিত্ব, সঙ্গীতপ্রিয়তা, ধর্মজ্ঞান, প্রভৃতি যে সকল স্নায়ুকেন্দ্র হইতে প্রেরণা লাভ করে, তাহা মানবেতর জীবের নাই। এই সকল প্রেরণার অধিকারী বলিয়াই মানুষ মনুষ্যত্বের দাবী করিয়া থাকে। এইগুলি আছে বলিয়াই যে মানুষের পাশব প্রবৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নহে। মনুষ্যত্বের প্রভাবে

সে পাশব প্রবৃত্তিগুলি দমিত ও নিয়মিত করিয়া মানুষোচিত গুণগুলি বিকশিত করিয়াছে। এই বিষয়ে সকলেই সমান কৃতকার্য হয় নাই। যে যত বেশি কৃতকার্য হইয়াছে, সেই তত বেশী 'মানুষ' হইয়াছে। এই কথা মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবেও যেমন সত্য, পরিবার, সমাজ ও জাতির পক্ষেও ঠিক তেমনি সত্য। ব্যক্তি লইয়াই পরিবার, পরিবার লইয়াই সমাজ এবং সমাজ লইয়াই জাতি ও দেশ। সুতরাং ব্যক্তির জীবন সুনিয়ন্ত্রিত হইলে, জাতির জীবনও সুনিয়ন্ত্রিত হইবে।

পানাসক্তির একটি প্রধান কুফল এই যে, ইহা মানুষের উক্ত 'হায়আর সেণ্টার্স্'গুলিকে নিষ্ক্রিয় বা বিকৃত করিয়া দেয়। এই জন্যই অতি লজ্জাশীল ব্যক্তিও পানোন্মত্ত হইলে লজ্জাহীন হইয়া পড়েন। যিনি স্বভাবতঃ ভীরু, তিনিও পানের ফলে সহসা সাহসী হইয়া পড়েন, যে সকল কার্য অতীব ঘৃণিত ও কদর্য, তাহাও পানাসক্ত ব্যক্তির নিকট সহজ হইয়া যায়। মোট কথা, মানুষের সর্বপ্রকার মনুষ্যোচিত গুণাবলী ধ্বংস করিবার অমোঘ অস্ত্র এই পানাভ্যাস। ইহার ফল শুধু সাময়িক নহে। এই অভ্যাস যতই পুরাতন হইতে থাকে, ততই ইহার কুফলগুলি শরীরে ও মনে স্থায়ী হইতে থাকে। স্বভাব ও চরিত্রেরও বিবিধ প্রকার অবনতি হইতে থাকে।

পানাসক্তির ফলে শরীরে বিবিধ রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সামান্য কোষ্ঠকাঠিন্য হইতে আরম্ভ করিয়া রক্তচাপ-বৃদ্ধি এবং যকৃতের সাংঘাতিক পীড়া পর্যন্ত এই কদভ্যাসের কুফলরূপে প্রকটিত হইয়া জীবন দুর্বহ করিয়া ফেলে।

প্রকাশ্যে জানা না গেলেও একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, যকৃতের বিবিধ প্রকার কঠিন রোগের মূল কারণ পানদোষ। অবশ্য অন্য বহু কারণেও যকৃতের দোষ হইতে পারে।

শারীরিক ব্যাধি সাধারণতঃ রোগীকেই বিব্রত করে, রোগীই তাহার অধিকাংশ ফল ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু পানদোষে যে মানসিক অবনতি হয়, তাহার ফল শুধু পানাসক্ত ব্যক্তিই ভোগ করে না। ইহার ফলাফল অতীব সুদূর-প্রসারী। ইহার প্রথম কুফল ভোগ করেন ইহার নিকটতম আত্মীয়েরা। স্ত্রীর জীবন অভিশপ্ত হইয়া উঠে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ইহার বিবিধ বিকৃত ব্যবহারে নিপীড়িত হইতে থাকেন। বিদেশে থাকিতে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম, একটি পানাসক্ত পরিবারের কথা। সন্ধ্যা হইলে সেই পরিবারস্থ নারীরা দুইখানি প্লাকার্ড বুকে পিঠে ঝুলাইয়া লইতেন। প্লাকার্ড দুইখানি সূতা দিয়া বাঁধা। এই সূতা দুইটি দুই কাঁধের উপর থাকিত। প্লাকার্ডে লেখা—ডেজি, অন্টি, মলি, মামি, পেগি, ইত্যাদি। এই সতর্কতা সত্ত্বেও বিবিধ প্রকার সংঘর্ষ হইতে থাকে। ক্রমশঃ বিষপান, গৃহত্যাগ, প্রভৃতি নানাপ্রকার দুর্ঘটনার পর রিভলভারের গুলীতে একটি জোড়া খুনের সঙ্গে গল্পের সমাপ্তি ঘটে। এই গল্পটি অবশ্য গল্পই। তথাপি ইহার একটা খুব গভীর মর‍্যাল আছে। কারণ পানের পর মানুষের 'হায়আর সেণ্টার্স্'গুলি অকর্মণ্য হইয়া গেলে, মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব থাকে না। এ অবস্থায় তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে।

অতি অল্পমাত্রা পানে হয়তো তেমন প্রবল প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু এই মাত্রা-নিয়ন্ত্রণ এক প্রকার অসম্ভব। কারণ, পানাসক্তির প্রধান প্রলোভন সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি। অভ্যাসের ফলে, যে মাত্রায় প্রথমে যথেষ্ট উত্তেজনা হয়, সে মাত্রায় কিছুদিন পরে আর সে উত্তেজনা হয় না। সুতরাং মাত্রা বর্দ্ধিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ফলে, মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। মাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতে যে ইচ্ছাশক্তি ও সংযমশক্তির প্রয়োজন, 'হায়আর সেণ্টার্‌স্'-এর নিষ্ক্রিয়তার ফলে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই সংযমশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির বিলোপই ইহার সর্বনাশা শক্তির মূল কারণ। সুস্থ অবস্থায় পানদোষের কুফল সম্যক উপলব্ধি করিয়াও ইহা হইতে বিরত হইবার ক্ষমতা লোপ পায়।

পানদোষের একটা প্রধান বিপদ এই যে, ইহা অতি সহজেই পরিবারের মধ্যে সংক্রামিত হয়। আমাদের পানাহারের অভ্যাসগুলি আমরা প্রধানতঃ পরিবারের মধ্যেই অর্জন করিয়া থাকি। মাছ খাওয়া, মাংস খাওয়া, পেঁয়াজ খাওয়া, নিরামিষ খাওয়া, ডাব খাওয়া, চা খাওয়া, লেমনেড খাওয়া, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার আহারের অভ্যাস আমরা শৈশব হইতেই আত্মীয়-পরিজনের নিকট হইতেই অর্জন করি। সেই জন্য কোন পরিবারে এক বার এক জন পানাসক্ত হইলে ক্রমশঃ এই দোষ পরিবারবর্গের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। কালক্রমে ইহা একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক ব্যাধিতে পরিণত হয় এবং পুরুষানুক্রমে শাখা-প্রশাখা-সমেত অগণিত পরিবার এই

জঘন্য এবং সাংঘাতিক ব্যাধিতে ভুগিতে থাকেন। ক্রমশঃ ইহার আনুষঙ্গিক দোষগুলিও অনুপ্রবেশ করিতে থাকে। এই জন্যই এই ব্যাধিটি সকল প্রকার ব্যাধি অপেক্ষা ভয়ানক ও মারাত্মক। ইহার কোন চিকিৎসা নাই বলিলেই হয়।

অনেক সময়ে দেখা যায়, পানাসক্ত ব্যক্তির মধ্যেও নানা সদ্‌গুণ, কর্মকুশলতা এবং প্রতিভার বিকাশ রহিয়াছে। আমার ধারণা, এই ব্যক্তিরা তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা শেষ করিবার পর এবং প্রতিভা বিকাশের আরম্ভের পর পানাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। কাজেই পানদোষ সত্ত্বেও ইঁহাদের কর্মশক্তি রহিয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিগণের পিতৃ-পিতামহ নিশ্চয়ই পানাসক্ত ছিলেন না। পানাসক্ত ব্যক্তিগণের পুত্র-পৌত্রেরা বিশেষ গুণশালী ও প্রতিভাবান হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম আবিষ্কার করা যাইবে না। মানুষের শরীর ও মন অতীব সূক্ষ্ম, অতীব বিস্ময়-কর বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। শরীর ও মনের সম্বন্ধও অতীব জটিল। সুতরাং কুৎসিত রোগগ্রস্ত মানুষের সন্তানের পক্ষেও সুস্থ ও স্বাভাবিক হওয়া অসম্ভব নহে। তা ছাড়া, অন্যান্য গুণাবলী থাকিলেও তাহা পানাসক্তির সমর্থক বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। পানাসক্তির বিবিধ দোষ পানাসক্ত ব্যক্তিরা নিজেরাও জানেন এবং মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। বহু পানাসক্ত বয়স্ক ব্যক্তি পানাসক্ত সন্তানের মধ্যে নিজেরই বীভৎস প্রতিচ্ছবি দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়া থাকেন।

পানাসক্ত ব্যক্তিগণের একটি মানসিক বিশেষত্ব এই যে, তাহারা নিজের কদভ্যাসের সঙ্গী চায়। সেই জন্য তাহারা সুযোগ পাইলেই বন্ধুত্বের সহায়তায় বা আত্মীয়তার আকর্ষণে অন্যকে পানমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করে। আমরা যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতাম, তখন হিন্দু হোষ্টেলের একটি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রের বন্ধু বাহির হইতে পানীয় লইয়া গিয়া তাহার সিঙ্গল-সীটেড ঘরের মধ্যে পানাভ্যাস শিখাইয়াছিল। এই শিক্ষার ফল তাঁহাকে চির জীবন ভোগ করিতে হইয়াছে। অন্য সকল দোষ-গুণের ন্যায় এই দোষটিও বিশেষ ভাবে সঙ্গ-জাত। সুতরাং সর্বদা এ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সতর্ক না থাকিলে কোন পানাসক্ত ব্যক্তির কবলে পড়িয়া যাওয়া অতি সহজ। তবে যাহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, এই অভ্যাসটি একটি গুরুতর পাপ, তাহার পক্ষে এই প্রলোভন বর্জন করা একেবারেই কঠিন নহে।

পাশ্চাত্ত্য অনেক দেশে পানাভ্যাস সুপ্রচলিত, তাহারা এই অভ্যাসকে নিন্দনীয় মনে করে না, ইত্যাদি যুক্তি নিরর্থক। ইংলণ্ডেও বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ পান-বিরোধী। কোন দেশে বা কোন সমাজে একটি কদভ্যাস সুপ্রচলিত বলিয়াই তাহাকে শ্রেয়ঃ মনে করা যায় না। চীন দেশে ব্যাপক ভাবে অহিফেন সেবনের প্রথা ছিল, এখনও অনেক অঞ্চলে আছে, তাই বলিয়া অহিফেন-সেবন সদভ্যাস নহে। কেহ কেহ হয়তো শীতের প্রকোপকে ইহার জন্য দায়ী করিবেন। ইহাও সত্য নহে। পাশ্চাত্ত্য দেশের আহার-ব্যবস্থার

মধ্যে যে আমিষ পদার্থ থাকে, তাহাতেই প্রচুর পরিমাণ দেহতাপরক্ষক উপাদান আছে। বিশেষ কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন হইলে মৎস্য, মাংস, মাখন প্রভৃতির মাত্রা কিঞ্চিৎ বাড়াইয়া দিলেই শরীরাভ্যন্তরস্থ তাপ বর্ধিত করা যাইতে পারে। এ জন্য বিষপানের কোন প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, স্কটল্যাণ্ডের প্রচণ্ড শীতে, যখন তাপ শূন্যেরও নীচে নামিয়া গিয়াছে, সমগ্র প্রদেশ বরফে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তখনও এক বিন্দু পান না করিয়াও কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। সুতরাং শীতের অজুহাত একেবারেই অচল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিশেষ বিশেষ রোগে বা বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ঔষধরূপে অ্যালকহল আবশ্যক হইতে পারে। এই সকল স্থলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে সামান্য পরিমাণে এবং অল্প দিনের জন্য ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্ট্রিকনিন, আর্সেনিক, মরফিন প্রভৃতি প্রয়োজনানুসারে এমন অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়, তদপেক্ষাও অধিক সতর্ক হইতে হইবে অ্যালকহল ব্যবহারে। কারণ ঔষধ-রূপ সূচ হইয়া ইহা প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ নেশা-রূপ ফাল হইয়া ইহকাল ও পরকাল ঝরঝরে করিয়া দিবার আশঙ্কা রহিয়াছে। স্ট্রিকনিন প্রভৃতি বিষ বেশি খাওয়া অসম্ভব, কারণ তাহাতে মৃত্যু ঘটে। অ্যালকহলে শারীরিক মৃত্যু সহজে না ঘটিলেও উহার অভ্যাসে মনুষ্যত্বের মৃত্যু ঘটায়। বৃদ্ধবয়সে, রোগাবসানে বা অন্যান্য দুর্বলতার জন্য সাময়িক অবসাদ দূর করিবার জন্য

বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট টনিক স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইগুলির মধ্যে ফস্‌ফেট্‌স্‌, লেসিথিন, ষ্ট্রিকনিন প্রভৃতি উপাদান থাকে, স্বল্প পরিমাণে অ্যালকহলও থাকে। উক্ত উপাদানগুলি স্নায়ু, মস্তিষ্ক এবং পাচক-যন্ত্রের পক্ষে হিতকারী এবং সাময়িক অবসাদনাশক। এই সকল ঔষধও ক্রমাগত ব্যবহার অনুচিত। কিছুদিন ব্যবহার করিয়া আবার দীর্ঘ দিন বন্ধ রাখা উচিত। যাঁহারা সুমতিবশতঃ পানাভ্যাস ত্যাগ করিতে চান, অথচ অবসাদ নিবারক কিছু না হইলে চলে না, তাঁহারা অল্প পরিমাণে উক্ত টনিক জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করিতে পারেন। ক্রমশঃ উহাও পরিত্যাগ করিতে আর কষ্ট হইবে না। শারীরিক দুর্বলতা ও অবসাদনিবারক হোমিও-প্যাথিক ঔষধও ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে কোন কুফলের সম্ভাবনা থাকে না

পানাভ্যাস যাহাতে না হইতে পারে, সেজন্য শৈশব এবং কৈশোর হইতেই এই কার্যটিকে অতীব ঘৃণিত ও নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে। চৌর্য, নরহত্যা, প্রভৃতি অপেক্ষা এই অপরাধ সহস্রগুণে অধিক ভয়ানক ও কদর্য, ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নরহত্যাদিতে ব্যক্তিবিশেষই ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু পানদোষ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশ, সমস্তই বিষাক্ত ও কলঙ্কিত করিয়া তোলে। প্রথম হইতে এই কার্যের প্রতি একটা আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করিতে হইবে। যুক্তি-তর্ক পরের কথা। জগতে এমন কোন কদর্য ও সাংঘাতিক পাপ নাই, যাহা ভোট বা যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা যায় না।

সুতরাং এই সর্বনাশা অভ্যাস হইতে মুক্ত থাকিবার প্রকৃষ্ট পথ একটা বদ্ধমূল মানসিক সংস্কার ও রুচি। যাহারা নিরামিষাশী তাহাদিগকে যুক্তি দিয়া যেমন মাছ খাওয়ান যায় না, তেমনি যাহারা পানাভ্যাসকে পাপ বলিয়া মনে করে, তাহাদিগকে পান করান যায় না। পানাভ্যাসের বিপক্ষে প্রবল যুক্তি তো আছেই এবং এই জন্যই ইহা সর্বকালে সর্বদেশে নিন্দিত হইয়াছে। ইহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট পথ ইহার অতি একটা গভীর নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণা। এই অভ্যাস পরিত্যাগ করাও কঠিন নহে, অবশ্য যাহারা পরিত্যাগ করিতে চায় তাহাদের পক্ষে। যে নারী চির জীবন দুই বেলা মাছ খাইয়া আসিতেছেন, মাছ না হইলে যাঁহার গলা দিয়া ভাত নামে না, তিনিও স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং কিছুদিন কষ্ট হইলেও, পরে এই মাছের গন্ধও তাঁহার কাছে অসহনীয় মনে হয়। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলে কোন অভ্যাসই মানুষকে দাসত্বে আবদ্ধ করিতে পারে না।

অতি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পানাভ্যস্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ সর্ব প্রকার লজ্জা ঘৃণা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া পানটাকে এমনই অপরিহার্য মনে করে যে, অন্য সব কিছুই তাহার কাছে লঘু মনে হয়।

জীবনের এই মর্মান্তিক ট্রাজেডির তুলনা নাই। এই রোগের চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং ইহার প্রতিষেধের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। বাল্য ও কৈশোরে প্রত্যেকের

মনে ইহার প্রতি একটি দৃঢ়মূল ঘৃণা সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাকে সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ বলিয়া মনে করিতে হইবে। অপর দিকে, যাহাতে এই বিষে ক্রয় বিক্রয় সর্বত্র নিষিদ্ধ হয়, তাহার জন্য সর্ব শ্রেণীর সকলকেই অবহিত হইতে হইবে। কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, ক্যানসার প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে সকল চেষ্টা হইতেছে, তদপেক্ষা বহুগুণে প্রবলতর প্রচেষ্টা করিতে হইবে এই সর্বনাশা শত্রুর ধ্বংস সাধনে।

আহারের সময়

পাখী জলজন্তু ও বন্যজন্তুর আহারের নির্দিষ্ট সময় নাই। কারণ, তাহারা সময় মত আহার্যবস্তু সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না। অন্য সকল জীবেরই আহারের সময় মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে। গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল, গরু, মহিষ প্রভৃতির আহারের সময় নির্দিষ্ট থাকে। অসময়ে আহার দিলে গো-মহিষাদির স্বাস্থ্যহানি ঘটে, দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমিয়া যায়।

প্রায় সকল দেশেই এবং সকল সমাজেই আহারের নির্দিষ্ট সময় আছে। ইংলণ্ডে সকালে আটটায় ব্রেকফাষ্ট, একটায় লাঞ্চ, সাড়ে চারটায় হালকা চা, রাত্রি আটটায় ডিনার, ইহাই সাধারণ নিয়ম। যাহার যে সময়ে আহার করা অভ্যাস, তাহা হইতে অল্প কয়েক মিনিটের বেশি এদিক ওদিক হয় না। কুলি, মজুর, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, পর্যটক, ধনী, নির্ধন, কোন শ্রেণীর কোন ব্যক্তিই আহারের সময়ের ব্যতিক্রম করে না। পথে ঘাটেও ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই। কারণ, ট্রেণে, জাহাজে, প্লেনে, সর্বত্রই ঠিক সময়মত আহার্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে। মোটরে বা বাসে দীর্ঘ ভ্রমণের সময়েও ইহার ব্যতিক্রম হয় না। পথের পার্শ্বে সময়মত থামিয়া লাঞ্চ, চা, প্রভৃতি খাওয়া যায়, পর্যটনের এরূপ ব্যবস্থা সর্বত্রই সম্ভব। স্কটল্যাণ্ডেও সময়ানুযায়ী আহারের ব্যবস্থা। তবে বৈকালিক

চা একটু দেরীতে করিয়া ডিনারের মত পূর্ণ আহারের ব্যবস্থা আছে। ইহাকে হাই-টি বলে। তারপর রাত্রে শয়নের পূর্বে সামান্য ফল, কোকো প্রভৃতি দ্বারা সাপার খাওয়া হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকাতেও আহারের সময় নির্দিষ্ট আছে। কোন নিমন্ত্রণাদিতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় না।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে, বিশেষতঃ সহরে, যেখানে অগণিত লোকের বাস এবং অসংখ্য প্রকার কর্মচাঞ্চল্য, আহারের একটা ধরাবাঁধা সময় নাই। আহারের সময়-বিষয়ে আমরা একেবারে স্বাধীন। কিন্তু মুস্কিল এই যে, প্রকৃতিদেবী এতখানি স্বাধীনতা পছন্দ করেন না।

প্রকৃতিদেবী একদিকে যেমন পরম করুণাময়ী, তেমনি অন্যদিকে ভীষণ কঠোরা। তিনি মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। মানুষ ভুল করিবে, সংযম হারাইবে, ইহা জানিয়াই তিনি এমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, যাহাতে সহজে মানুষের দেহের ক্ষতি না হয়। যেমন, আমাদের পাকস্থলীটি এমনভাবে প্রস্তুত যে, যতখানি আহার আমাদের প্রয়োজন, তাহার অনেক বেশী আহার্য ইহার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া যায় এবং সুস্থ শরীরে তাহাতে কোন বিশেষ ক্ষতিও হয় না। কিন্তু সকল বিষয়েরই একটা সীমা আছে। সেই সীমা লঙ্ঘন করিলে প্রকৃতিদেবী অতি কঠোর হস্তে শাস্তি দিয়া থাকেন।

অসময়ে আহার একটি অতি গর্হিত অভ্যাস। ইহার কুফল

সুস্থ শরীরে দুই চারিদিন অনুভূত হয় না বটে, কিন্তু একটু বেশী দিন ধরিয়া ক্রমাগত সময়ের অনিয়ম করিলে, তাহার বিষময় ফল ফলিয়া থাকে।

আহার্যবস্তু আমাদের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে, পাকস্থলী হইতে বিবিধ পাচকরস নির্গত হইয়া উহাকে আংশিকরূপে পরিপাক করে। এই পাচকরসের মধ্যে জল, পেপসিন, রেনিন, লিপেস, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, বিবিধ ফসফেট, প্রভৃতি উপাদান রহিয়াছে। আংশিকভাবে পরিপাক হইবার পর খাদ্য-বস্তু পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া পাইলোরাস অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশ ডুয়োডেনামে প্রবেশ করিলে, প্যানক্রিয়াস, যকৃৎ এবং পিত্তস্থলী হইতে পাচকরস নির্গত হইয়া উক্ত অর্ধ-পাচিত খাদ্যবস্তুর সহিত মিলিত হয় এবং তাহাকে অনেকাংশে পরিপাক করিয়া ফেলে। পরিপাক ক্রিয়ার অবশিষ্টাংশ অন্ত্রের মধ্যেই সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। প্যানক্রিয়াসের রসের মধ্যে ট্রিপসিন, অ্যামিলেস, লিপেস, সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি উপাদান আছে। পিত্তরসের মধ্যে সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট, বিলিরুবিন, বিলিভার্ডিন, চোলেষ্টেরল, লেসিথিন, খনিজ লবণ প্রভৃতি উৎপাদন আছে। চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় আধ সের হইতে এক সের পিত্তরস নির্গত হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ আমরা যে সময়ে আহার করি, সেই সময়ে, আহার না করিলেও অভ্যাসবশতঃই বিবিধপ্রকারের খানিকটা পাচকরস পাকস্থলীতে এবং ডুয়োডেনামে সঞ্চিত হয়। ইহাকেই আমরা সাধারণতঃ "পিত্ত পড়া" বলি। অনেক সময়ে

ডুয়োডেনাম হইতে খানিকটা পিত্তরস উল্টাদিকে পাকস্থলীর মধ্যে চলিয়া যায়। খালি পাকস্থলীতে এবং খালি অন্ত্রে উক্ত পাচকরসসমূহ পতিত হইলে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের ক্ষতি হয়। কারণ, উক্ত পাচকরসের মধ্যে কতকগুলি অতি তীব্র উপাদান আছে। ঐ সকল রসদ্বারা পাকস্থলী যে নিজেই পরিপাচিত হইয়া যায় না, ইহাই পরম বিস্ময়ের বিষয়। বার বার খালি পাকস্থলীতে এবং খালি অন্ত্রে পাচকরস পতিত হইবার ফলে অনেক সময়ে পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রে ক্ষত উৎপন্ন হইয়া থাকে। অসময়ে আহারের আর একটা কুফল হইল এই যে, খানিকটা পাচকরস পূর্বেই খালি পাকস্থলীতে নির্গত হইয়া যাইবার ফলে, পরে যখন অসময়ে আমরা আহার করি, তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে রস উদ্বৃত্ত থাকে না। কাজেই পরিপাকক্রিয়া ভালরূপে নিষ্পন্ন হয় না। অসময়ে আহারের এই দ্বিবিধ কুফল বহু ব্যক্তির পাকস্থলীর এবং অন্ত্রের বিবিধ রোগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রে একবার ক্ষত হইলে, তাহার চিকিৎসা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কারণ, বাহিরে ক্ষত হইলে, সেই ক্ষতের চিকিৎসা যে প্রণালীতে হইয়া থাকে, সে প্রণালী পেটের অভ্যন্তরে প্রযোজ্য নহে। পাকস্থলীর ক্ষতে মলম লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া রাখা যায় না, বা আহার বন্ধ করা যায় না। পাকস্থলীর স্বাভাবিক রসনিঃস্রাবও ঠিক ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ক্ষতের সহজতম যে চিকিৎসা, অর্থাৎ ক্ষতদুষ্ট অঙ্গ সম্পূর্ণ কাটিয়া বাদ দেওয়া, তাহাও এস্থলে প্রযোজ্য নহে। আরো একটা মুস্কিল এই যে, সত্যই ক্ষত

হইয়াছে কি না, হইয়া থাকিলে তাহা ঠিক কোনখানে এবং ক্ষতের আকার ও প্রকার কিরূপ, তাহা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, বহু পরীক্ষা এবং বহু এক্স-রে-চিত্র লওয়া সত্ত্বেও রোগ সম্পূর্ণরূপে ধরা যায় নাই। অথচ এই রোগের ফল অতি ভয়াবহ। পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইলেই শরীরের পুষ্টি সাধনে ব্যাঘাত অনিবার্য। পুষ্টি না হইলে শরীরে যে কোন উপসর্গ এবং যে কোন ব্যাধি আসিয়া জুটিতে পারে। আহারের পরে বা অন্য সময়ে যে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহ বুঝিতে পারিবে না।

অসময়ে আহার ব্যতীত অন্য কোন কারণে যে ব্যাধি হইতে পারে না তাহা নহে। অত্যধিক আহার এবং অন্যান্য নানাবিধ কদভ্যাসের জন্যও ব্যাধি হইতে পারে। তবে, যতগুলি পাকস্থলী ও অন্ত্রের রোগী আমি দেখিয়াছি, তাহাদের ইতিহাস হইতে আমি নিঃসন্দেহ যে, অত্যধিক আহার অপেক্ষা অসময়ে আহারই অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগের মূল কারণ।

এ বিষয়ে আমরা যে কত অসতর্ক, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। যিনি সাধারণতঃ সাড়ে নয়টার সময়ে খাইয়া উর্দ্ধশ্বাসে অফিসে ছোটেন, রবিবার হইলেই বা ছুটি পাইলেই তিনি দেড়টার সময় খাইবেন। ছুটি উপভোগ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় পাক্‌যন্ত্রের উপর অস্বাভাবিক অত্যাচার। শিক্ষা-বিভাগের অনেকে দশটায় ক্লাস থাকিলে নয়টায় খান, আবার বারটায় ক্লাস থাকিলে এগারটায় খান, আবার ক্লাস না থাকিলে

খান দেড়টায়। আমি একটি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনি কখন খান? তিনি বলিলেন, সাধারণতঃ বারটায়, তবে যেদিন কোর্টে যাইতে হয়, সেদিন নয়টায়। কোন উৎসব হইলেই আহারের সময়ের ব্যতিক্রমটাই আদর আপ্যায়নের প্রথম উপাদান। বাড়ী হইতে বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে আমাদের কি পুলক! আহারাদি বিষয়ে একেবারে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম! মনে করুন, কেহ কুচবিহার বেড়াইতে যাইতেছেন। বাড়ী হইতে বাহির হইবার প্রাক্কালে, তা সে যে সময়েই হউক, খান আঠারো লুচি এবং আধ সের আলুর দম খাইয়া বাহির হইলেন। তারপর বর্ধমানে আধ সের সীতাভোগ-মিহিদানা, তারপর বোলপুরে চা এবং ছয়খানা টোষ্ট, তারপর সকরিগলিতে ষ্টিমারে উঠিয়া বরফের মত ঠাণ্ডা ভাত এবং মাংস, তারপর কাটিহারে খান বার পুরী ও তরকারী, তারপর শিলিগুড়িতে খান আষ্টেক রাম সিঙ্গাড়া ইত্যাদি। তারপর বহুদিন পরে বন্ধুকে পাইয়া কুচবিহারের বন্ধুটির সঙ্গে কোনদিন একটায় কোনদিন দুইটায় আহার। তারপর কলিকাতায় ফিরিয়াই নয়টার সময়ে নাকে মুখে আহার গুঁজিয়া অফিস করা। ইহাই তো আমাদের মজ্জাগত অভ্যাস! আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রিয়তমা পতিপ্রাণা সহধর্মিণীদিগকেও সহযোগিনী করিয়া লইতেও আমাদের কুণ্ঠা নাই।

কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, আমাদের জীবনে নানা বিশৃঙ্খলতা, কাজ ও নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট, এর মধ্যে আহারের সময় ঠিক রাখা সম্ভব নয়। একথার কোন মূল্য আছে বলিয়া

আমার মনে হয় না। ইউরোপের প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিষ্কর্মা রাজপুত্র নয়। তাহাদেরও নানাপ্রকার কাজ ও ঝঞ্ঝাট আছে। তথাপি তাহারা সময় মত আহার করিয়া থাকে।

অম্ল, অজীর্ণ, শূল, পাকস্থলীর ক্ষত, অন্ত্রের ক্ষত প্রভৃতি রোগ বহু কারণে হইয়া থাকে। অসময়ে আহার ইহার একমাত্র কারণ নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইউরোপে কাহারও এরূপ অসুখ হইত না। তবে অভিজ্ঞতা হইতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসময়ে আহার উক্ত ব্যাধিগুলির একটি মুখ্য কারণ।

কিরূপে আমাদের এই কদভ্যাস দূরীভূত হইবে তাহা বলিতে পারি না। এই কদভ্যাসের ফল সময়ে সময়ে কি ভয়ানক আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে হয়তো ক্রমশঃ আমরা নিয়মিত সময়ে আহারের অভ্যাস আয়ত্ত করিতে পারিব।

বিধবার আহার ও বেশ

আমাদের সমাজে বিধবাদিগের অশন এবং বসন সম্পর্কে অনেকগুলি বিধিনিষেধ আছে। সকলেই সব বিধিনিষেধ সমভাবে পালন অবশ্য করেন না, কিন্তু নগরে ও পল্লীতে লক্ষ লক্ষ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারে আহার ও বেশ সম্পর্কে বিধবাদিগের আচরণে বহু পরিমাণে সামঞ্জস্য আছে। ধনী পরিবারের রীতি ও ব্যবহার ঈষৎ ভিন্ন হইলেও মোটের উপরে তাঁহারাও অনেকটা একই ধরণের প্রথা মানিয়া চলেন। সর্বস্তরের সর্বপ্রকার রীতির মূলে আছে দুইটি উপাদান, নিরামিষ আহার এবং শুভ্র বেশ। এই সম্বন্ধেই দুই-একটা কথা বলিতেছি। স্থান, কাল, পাত্র ভেদে এবং বর্তমান যুগের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে বিধবাদিগের পক্ষে চিরাচরিত প্রথার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা কতটা আছে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবেচনা ও আলোচনা অসঙ্গত হইবে না।

প্রথমতঃ খাদ্যের কথা বিবেচনা করা যাক। আমিষ ও নিরামিষ আহার সম্বন্ধে যে পুরাতন ধারণা আছে, তাহার সবখানি ঠিক নয়। গরু আমিষ, অথচ গরুর দেহনির্গত দুধ নিরামিষ, এটা যুক্তিসহ নয়। এই যুক্তিতে মৎস্যের দেহনির্গত মাছের ডিম বা হংসীর দেহনির্গত হাঁসের ডিম নিরামিষ হওয়া উচিত। এই সূক্ষ্ম প্রভেদ ছাড়িয়া দিলেও, মোটের উপর

আমিষ ভোজনের বিপক্ষে যুক্তি এই যে, উহা শরীর ও মনের উত্তেজক। কিছু পরিমাণে ইহা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। আহারের পরিমাণ ও রন্ধনের প্রক্রিয়ার উপরেই সুপাচ্যতা এবং লঘুতা নির্ভর করে। অল্পপরিমাণ চুনোমাছের ঝোল অপেক্ষা ঘি-গরমমশলা দিয়া রাঁধা আধ সের ছোলার ডাল ও ছানার ডালনা অধিক দুষ্পাচ্য এবং অধিক উত্তেজক। গল্প আছে, একটি একাদশীর দিনে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তিনি সেদিন একাদশী পালন করিতে চান কিনা। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহার উত্তর নির্ভর করিতেছে একাদশীর ব্যবস্থার উপর। যদি প্রতিদিনের সাধারণ ডাল, ভাত, মাছ, তরকারীর পরিবর্তে লুচি, ছোলার ডাল, ছানার ডালনা, আলুর দম, রাবড়ী, দই, সন্দেশ, আম প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে তাহা হইলে তিনি একাদশী ব্রতই পালন করিবেন। এস্থলে একাদশী ব্রত পালন ব্যাপারটি সংযমের পরিচায়ক নহে। অথচ এই নিরামিষ ব্রত উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা করিতে বহুক্ষেত্রেই বহু ব্যয় এবং অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। দরিদ্র পরিবারে এই রাজসিকতার সম্ভাবনা না থাকিলেও এই দুর্দিনে সাধারণ খাদ্যের পরিবর্তে একটি বা দুইটি বিধবার জন্য উপযুক্ত পৃথক ব্যবস্থা করিতে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিশেষ ব্রত পালনের কথা ছাড়িয়া দিলেও দৈনন্দিন নিরামিষ ব্যবস্থাও সহজ নহে। পৃথক চাউল, পৃথক উনুন, পৃথক বাসন, পৃথক রন্ধনের গৃহ বা পৃথক স্থান, পৃথক পাচক বা পাচিকা প্রভৃতির ব্যবস্থা অতীব কষ্টকর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধবাদিগকে

নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করিতে হয়। ফলে আহারের ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক হয় না। অধিকাংশ পরিবারেই সম্পূর্ণ পৃথক ব্যবস্থা করিবার মত স্বচ্ছলতা নাই। তারপর যাঁহারা স্বপাকে খান, শরীর অসুস্থ হইলে বা বার্ধক্যপীড়িত হইলে তাঁহাদের নিয়মিত খাওয়াই হয় না। উপবাসে বা চিড়া, মুড়ি, সাবু প্রভৃতি খাইয়া কোনমতে জীবনধারণ করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, এই পৃথক রন্ধনের ব্যবস্থাজনিত ব্যয়বাহুল্য ও শ্রমবাহুল্যের জন্য পরিবারস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিবিধ প্রকার মনোমালিন্যেরও উদ্ভব হইয়া থাকে। অধিকাংশ পরিবারেই নারীরা রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। একটি বা দুইটি বিধবার রন্ধনের ব্যবস্থার জন্য আজকালকার দিনে কতখানি ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়, তাহা সকলেই মর্মে মর্মে বোঝেন। ইহার ফলে বিধবাদিগকে কতখানি দৈহিক বা মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয়, তাহাও ভুক্তভোগীরা জানেন। অথচ এই আমিষ ও নিরামিষ সম্পর্কে শুচিবায়ুটা একটু পরিত্যাগ করিলেই তো হয়। পরিবারস্থ অন্যান্য সকলের সঙ্গে একত্র ভোজনে এমন কি বাধা? নিতান্ত কাহারও যদি সংস্কারে বাধে, মাছটা বাদ দিয়া খাইলেই হয়। একই উনুনে বা একই পাচক দ্বারা রান্না করা হইলেই সমগ্র খাদ্য মৎস্য-মাংসে পরিণত হইয়া যাইবে এবং সেই আমিষ ঘরে রাঁধা নিরামিষ ডাল-তরকারী খাইয়া বিধবাদিগের মনোবৈকল্য উপস্থিত হইবে, ইহা সম্ভব নয়। আমিষ ও নিরামিষ আহারের মধ্যে পার্থক্য কিঞ্চিৎ থাকিলেও, তাহা এতটা ভয়াবহ নয়। অসংযত ও

অপরিমিত আমিষ আহার এবং অসংযত ও অপরিমিত নিরামিষ আহার উভয়ই সমান অনিষ্টকর। যে পানদোষে এক একটি সমগ্র পরিবার পুরুষানুক্রমে অধঃপাতে ও উৎসন্নে যায়, তাহাও তো সম্পূর্ণ নিরামিষ।

মনে করা যাক, পরম বৈষ্ণব ব্রজেশ্বরবাবু আত্মীয়স্বজন লইয়া বৃন্দাবন গিয়াছেন। একদিন রমণীয় অপরাহ্নে সপরিবারে যমুনার তীরে বসিয়া মৃদুমন্দ বায়ু উপভোগ করিতেছেন এবং গোপিনীমোহন বংশীধারীর বিবিধ লীলা স্মরণ করিয়া আত্ম-হারা হইয়াছেন। কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর ব্রজেশ্বর বাবুর একটি শালাজ শালপাতার ঠোঙা হইতে একখানি ফাউল-কাটলেট আলগোছে ব্রজেশ্বর বাবুর হাতের মধ্যে গুঁজিয়া দিলেন এবং যমুনার উচ্ছলচ্ছীকরাচ্ছন্ন স্নিগ্ধ মলয়ানিল সেবনে বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় ব্রজেশ্বর বাবুও আস্তে আস্তে কাটলেটখানি খাইয়া ফেলিলেন। ইহার ফলে রাজেশ্বর বাবুর মন তৎক্ষণাৎ 'অবৈষ্ণব হইয়া গেল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিয়া সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন এবং পরম শাক্ত হইয়া মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণে তৎপর হইয়া উঠিলেন, এরূপ হওয়া সম্ভব নয়। আবার মনে করা যাক, আধুনিক যুবক নবপরিণীতা বধুকে লইয়া মেট্রোয় ছবি দেখিতেছে। অন্ধকার ঘরে পার্শ্বস্থ বধুর চুড়ি-কঙ্কন-চুর-ব্রেসলেট-পরিশোভিত কোমল হাতখানি ধরিয়া আলগোছে একটি চকলেট গুঁজিয়া দিল এবং এই নিরামিষ চকলেট ভক্ষণের ফলে বধূটির মন পরম বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং সে তৎক্ষণাৎ স্বামীকে

ছাড়িয়া, সিনেমা ছাড়িয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ী ফিরিল এবং সন্ন্যাসিনী সাজিয়া গৃহত্যাগ করিল, এরূপ ঘটনাও সম্ভব নহে। কাটলেট ও চকলেটে প্রভেদ আছে, কিন্তু তাহা উক্তরূপ অঘটন ঘটাইতে পারে না।

সরল, সহজ, পবিত্র, কোলাহলহীন সুনির্মল পরিবেশের মধ্যে মন যখন সত্যই একটি শুচিতা ও সাধনোচিত পবিত্রতার আধার হইয়া উঠে, তখন আহারের সামান্য ব্যতিক্রমেরও হয়তো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের সাধারণ সামাজিক জীবনে আমরা যে পরিবেশের মধ্যে বাস করি, তাহাতে আহারের সামান্য তারতম্য কোনরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে না। আমাদের বিধবারা যে সকল সিনেমা দেখিয়া থাকেন, তাহার যে কোন একটিতে যে স্নায়বিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়, সারা বৎসর নিয়মিত ও পরিমিত আমিষ আহারে তাহার শতাংশের একাংশও হইতে পারে না। পাচক, ভৃত্য, আত্মীয়স্বজন, দেবর, ননদ, বধূ, শাশুড়ী, রোগ, শোক, বাসরঘর, সূতিকাগার, কলহ, মনোমালিন্য, অভাব, অনটন প্রভৃতি দ্বারা নিত্য পরিবেষ্টিত জীবনের পক্ষে আহারের সামান্য তারতম্যের কোন গুরুত্ব নাই। ইহারই মধ্যে পৃথক রন্ধন ও পৃথক আহারের ব্যবস্থা যে প্রতিদিন কত পরিবারে কত অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে এবং এই তুচ্ছ ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় যুবতী ও বৃদ্ধা, স্বাস্থ্যবতী ও রুগ্না, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী সকল শ্রেণীর বিধবাদিগকেই যে কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিতে হইতেছে, তাহার কোনই সার্থকতা নাই।

এখন বেশভূষার কথাটা একটু ভাবিয়া দেখা যাক। শুভ্রবেশ শুচিতার পরিচায়ক, সাধারণতঃ ইহাই আমাদের ধারণা। ধারণা একেবারে অমূলক নহে। কিন্তু ইহা লইয়া আমরা যে বাড়াবাড়ি করিয়া থাকি তাহার মূলে কোন যুক্তি নাই। যে কোন পরিচ্ছদই হউক না কেন, কিছুদিন ব্যবহার করিলেই মন তাহাতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। কোন নূতন বা স্থায়ী প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে না। প্রথম সাহেবী পোষাক পরিয়া কয়েকদিন কাহারও মেজাজটা একটু সাহেব-সাহেব হয়তো থাকে। কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখা যাইবে কোট-প্যাণ্ট পরিয়াই তিনি এক গাল পান খাইয়া ফিচ্ ফিচ্ করিয়া পথে পানের পিচ ফেলিতেছেন। আহারের ন্যায় বেশভূষারও মনের উপর যে প্রতিক্রিয়া আছে, তাহা পরিবেশের উপর অনেক নির্ভর করে। স্নিগ্ধ-শান্ত সাত্ত্বিক পরিবেশে শুভ্র বস্ত্র ও রঙীন বস্ত্রের মধ্যে যে পার্থক্য অনুভব করা সম্ভব, আমাদের কোলাহলময়, বিক্ষিপ্ত, বহুধা চঞ্চল সামাজিক পরিবেশে তাহা অনুভব করা যায় না। কণ্বমুনির আশ্রমের সাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্যে সহসা তুষ্মন্ত এক বালতী রঙ আনিয়া পিচকারী দিয়া মেয়েগুলির কাপড় রঙাইয়া দিলে, সে রঙ বস্ত্র হইতে দেহে এবং দেহ হইতে মন পর্যন্ত পৌঁছিয়া বিবিধ বিপর্যয় ঘটাইতে পারে। কিন্তু সকালে পরিচারিকাদের সঙ্গে খিটিমিটি করিয়া, মাছ-তরকারীর বাজার ঘাঁটিয়া, নাকে-মুখে খাবার গুঁজিয়া, ব্যাগ হাতে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কাজে ছুটিয়া, বাসে মানুষের ভীড়ের চাপে তুলিতে তুলিতে যাতায়াত করিয়া, যখন কোন মহিলা

নিষ্পেষিত মনে বাড়ী ফেরেন, তখন রঙের চৌবাচ্চায় চুবাইয়া দিলেও তাঁহার মনে কোন বিপর্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কাপড়ের রঙের বা পাড়ের সহিত মনের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ ও তুচ্ছ। পুলিশ বিভাগে একটু সন্ধান লইলেই জানা যাইবে যে, নগরে ও বাহিরে দিনে এবং রাত্রে যে সকল অপরাধ ও পাপকার্য সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার নায়কেরা প্রায় সকলেই শুভ্রবস্ত্র পরিহিত। সাদা ধুতী, সাদা গেঞ্জি, সাদা ফতুয়া, সাদা সার্ট, সাদা পাঞ্জাবী, সাদা চাদর প্রভৃতি সাদা পোষাকেই সর্বপ্রকার কুকার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক-চোর, মুনাফাখোর, চোরাকারবারী প্রভৃতি সকলেই সাদা পোষাক পরিয়া থাকেন। সাদা পোষাক কোনপ্রকার কুকার্যেরই প্রতিষেধক নহে।

অনেকে বিধবাদিগের স্বতঃ সনাক্তকরণের সহায়করূপে সাদা কাপড়ের সমর্থন করিয়া থাকেন। কোন স্থানে কোন নারীকে শুভ্রবস্ত্রে দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইনি বিধবা। কিন্তু এই সাইনবোর্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? পথে, ঘাটে, আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে, আনন্দে, উৎসবে, যেখানেই কোন বিধবা থাকিবেন বা যাইবেন, সেখানেই তাঁহার গায়ে একটি সাইনবোর্ড ঝুলান থাকিবে এবং তাহাতে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা থাকিবে, আমি বিধবা, অনাথা, নিরামিষাশী, ভ্রাতা বা দেবরের গলগ্রহ, স্বামী-হীনারূপে নির্যাতিত, স্বপাকে অর্ধাহারে বা অনাহারে শীর্ণ, অপয়া, কুমারী ও সধবাদিগের কৃপার পাত্র, বড়ি দিয়া বা কাঁথা সেলাই করিয়া দিনাতিপাত করি, মরিতেও ইচ্ছা করে না,

বাঁচিতেও ইচ্ছা করে না। এইরূপ একখানি সাইনবোর্ড সর্বদা বহন করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। অথচ এই দুর্দিনে, যখন যে-কোন প্রকার একখানি বস্ত্র সংগ্রহ করাই দুরূহ ব্যাপার, তখন বিধবাদিগের জন্য প্রয়োজনীয় সাদা ধুতী সংগ্রহের জন্য কত লোককে কত বিড়ম্বনা সহিতে হইতেছে। পুরুষের পক্ষে যেমন সাদা পোষাকে বিলাসিতা সম্ভব এবং পাড়সমেত কাপড়েও মিতাচার সম্ভব, তেমনি বিধবাদের পক্ষেও পাড়সমেত কাপড়ে শুদ্ধাচার সম্ভব। বর্তমান সমাজের বর্তমান পরিবেশে বিধবাত্ব প্রচার ছাড়া পাড়হীন কাপড়ের অন্য কোন সার্থকতা নাই।

আমিষ ও নিরামিষ আহারের এবং সাদা ও রঙীন বস্ত্রের মনের উপর প্রভাবে বৈষম্য আছে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু বর্তমান পরিবেশে এই বৈষম্য এত সূক্ষ্ম যে, তাহা অনুভবনীয় নহে এবং ইহার জন্য বিধবাদিগকে যে বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা সহিতে হয়, তাহার কোন যৌক্তিকতা নাই। এক ভরি মাছ ও দুই ভরি ছানার পার্থক্য অতীব সুদূরকল্পিত। বাড়ীতে সকলেই মাছভাজা, মাছের কালিয়া, মাছের অম্বল প্রভৃতি পরিতৃপ্তির সহিত খাইতেছেন, আর সেই সময়েই একটি বিধবা, হয়তো তিনি ঐ সকল মাছ কুটিয়াছেন এবং রান্নাও করিয়াছেন, এক বাটি সাবুতে একটি কলা চটকাইয়া নিজের আহার সম্পন্ন করিলেন। এটা যে কত বড় নৃশংসতা, তাহা আমাদের সংস্কারবিমূঢ় লুপ্তচেতন মন ধারণা করিতে পারে না। একদিন নহে, দুই দিন নহে, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর,

সর্বপ্রকার প্রলোভনের মধ্যে দিবারাত্র বাস করিয়াও এইরূপ নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের ফলে ইঁহাদের শরীর ও মন কিরূপ জড়ত্ব ও বিকারপ্রাপ্ত হয়, তাহার নিদর্শন সর্বত্রই পাওয়া যাইবে। এই অবস্থা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর নহে।

বাতব্যাধি

একটু অধিক বয়স্ক ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবিধপ্রকার বাত-ব্যাধিতে অনেকে ভুগিয়া থাকেন। আমরা যে সকল অবস্থাকে বা রোগকে সাধারণত বাত বলিয়া অভিহিত করি, তাহার বহু প্রকারভেদ আছে। শরীরের বিভিন্ন স্থানে, অস্থির সংযোগ-স্থলে (গিরায়), মাংসপেশীর মধ্যে, বিবিধ প্রকার ফুলা, প্রদাহ, বেদনা, প্রভৃতি কষ্টদায়ক লক্ষণ ও উপসর্গসমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখনও কখনও এই সকল বেদনা স্বল্পকাল স্থায়ী হয়, আবার কখনও কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

এক শ্রেণীর বাতব্যাধিকে গেঁটে বাত (gout) বলা হইয়া থাকে। এই বাতের প্রধান লক্ষণ কোন না কোন গিরাতে ফুলা ও বেদনা। এই রোগে দেখা যায় যে, রক্তের ভিতরের ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছে। স্বাভাবিক রক্তে কিছু পরিমাণ ইউরিক অ্যাসিড থাকে। একশত সি-সি-তে প্রায় দুই মিলিগ্রাম ইউরিক অ্যাসিড থাকে। সমস্ত শরীরের রক্তে মোট প্রায় একশত মিলিগ্রাম ইউরিক অ্যাসিড থাকে। গেঁটে বাতের আক্রমণের সময় ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ প্রায় পাঁচ মিলিগ্রাম হয়। এই সংখ্যাগুলি অবশ্য একটা মোটামুটি সংখ্যা। প্রত্যেক রোগীর পক্ষে এই সংখ্যার কিছু কিছু তারতম্য হইবেই। গিরায় এবং গিরার আশে পাশে এই অ্যাসিড সোডিয়াম বাই-ইউরেটরূপে (Sodium

biurate) জমিয়া থাকে। বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যদিও গেঁটেবাতের রোগীর রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের আধিক্য বর্তমান থাকে, তথাপি, ইউরিক অ্যাসিডকেই গেঁটে-বাতের কারণ বলা যায় না।

যেখানে যেখানে সোডিয়াম বাই-ইউরেট জমে, সেই সকল স্থানে অনেক সময়ে ইহার একটা পর্দা জমিয়া উঠে। অনেক সময়ে এই কারণে স্থানীয় অস্থি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাহার সন্নিকটবর্তী অন্যান্য অংশগুলিও (যেমন, লিগামেণ্ট, প্রভৃতি) ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। কানের মধ্যে এবং মূত্রগ্রন্থিতেও (Kidney) এই সোডিয়াম বাই-ইউরেট জমিতে পারে।

গেঁটে-বাতের প্রথম আক্রমণ সাধারণত রাত্রিকালে হয়। পায়ের বুড়া আঙুলেই ইহার সূত্রপাত। ফুলা, বেদনা, আনুষঙ্গিক জ্বর, প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। প্রথম প্রথম এই সকল উপসর্গ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কয়েকদিনের মধ্যে এই সকল উপসর্গের উপশম হয়। যতই দিন যাইতে থাকে, ততই ইহা বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। ক্রমশ হাতের কব্জি, আঙুল, পায়ের হাঁটু, প্রভৃতি আক্রান্ত হইতে থাকে।

গেঁটেবাতের আক্রমণ একবার হইলে, সাধারণত ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে পুনরায় আক্রমণ হইবেই। সুতরাং আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কালবিলম্ব না করিয়া সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্তব্য।

আমাদের বহু আহার্য বস্তুর মধ্যে পিউরিন (Purin) নামে একটি পদার্থ আছে। ইহা হইতে ইউরিক অ্যাসিড এবং

সোডিয়াম বাই-ইউরেট উৎপন্ন হয়। সুতরাং গেঁটেবাতের লক্ষণ দেখা দিলেই, যে সকল খাদ্যে পিউরিন আছে বা বেশি আছে, সেগুলি খাওয়া কমাইয়া দেওয়া আবশ্যক। স্বাভাবিক শরীরে এই পিউরিন মেটাবোলাইজ্‌ড্‌ (শরীরের অঙ্গীভূত) হইয়া যায়। এই মেটাবলিজম্‌ ব্যাহত হইলে, ইহা হইতে ইউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হইয়া শরীরের নানাস্থানে জমিতে থাকে। আমিষজাতীয় খাদ্য, যেমন মাছ, মাংস, প্রভৃতি, এগুলিতে অধিক পরিমাণে পিউরিন আছে। সেইজন্য গেঁটে-বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বেশি আমিষ ভোজন ভাল নয়।

এই রোগ কেন হয়, তাহা বলা সম্ভব নয়। পারিবারিক ধারা এই রোগের একটা প্রধান লক্ষণ। পিতা-মাতা এই রোগগ্রস্ত হইলে সন্তানেরও এই রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে। দেখা গিয়াছে, এই রোগের প্রাদুর্ভাব গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অপেক্ষা-কৃত কম। ইংলণ্ডে এবং জার্মানীতে এই রোগের প্রকোপ খুব বেশি। এই সকল তথ্য হইতে এই রোগের কারণ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কখনও কখনও আঘাত হইতে এই রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। যেমন, ফুটবল-খেলোয়াড়ের পায়ের বুড়া আঙুল বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, কালক্রমে এই বেদনা বাতে পরিণত হইতে পারে। ভোজনবিলাসিগণের এই রোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা বেশি।

গেঁটেবাত বহুদিন স্থায়ী হইলে, ইহার সহিত অনেক আনুষঙ্গিক উপসর্গ আসিয়া জোটে। অনেক সময়ে হাঁটু বা অন্য কোন গিরার নিকটবর্তী স্থানসমূহ একটু বিকৃত হইয়া

যায়। পরিপাকশক্তি কমিয়া যায়। কখনো কখনো রক্তচাপ-রোগের এবং বহুমূত্র রোগের লক্ষণ দেখা দেয়।

গেঁটেবাত ব্যতীত আরও বহু প্রকার রোগ আছে, সেগুলিকে আমরা সাধারণ বাত বলিয়া থাকে। ইহার কতকগুলির কারণ নির্ণয় করা যায় না। অপর গুলি আবার বিবিধ সংক্রামক রোগের পরিণামরূপে দেখা দেয়। প্রথম শ্রেণীর রোগকে আমরা স্বাভাবিক বাত বলিতে পারি। দ্বিতীয় শ্রেণীর রোগকে অন্যরোগজাত বাত বলিতে পারি।

সকল প্রকার বাতের লক্ষণগুলিই প্রায় একরূপ। যেমন, ফুলা, বেদনা প্রভৃতি। ইহার সঙ্গে শরীরের ওজন কমিয়া যাওয়া, শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, অতিরিক্ত ঘাম, রক্তাল্পতা এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে অনিয়মিত ঋতু, প্রভৃতি উপসর্গ থাকিতে পারে। যেস্থানে বাত হয়, সেইস্থানের মাংস শুকাইয়া যাওয়া, সেই সকল স্থান বিকৃত হইয়া যাওয়া, প্রভৃতি লক্ষণ কালক্রমে প্রকাশ পায়। বাত শরীরের বহুস্থানে হইতে পারে। তন্মধ্যে গোড়ালি, হাঁটু, কনুই, কোমর, প্রভৃতি স্থানে আক্রমণের সম্ভাবনাই বেশি।

এই রোগ সম্পূর্ণভাবে এবং স্থায়ীভাবে সারিয়া যাওয়া অতীব কঠিন। অন্যান্য সকল প্রকার পুরাতন কঠিন রোগের ন্যায় এই রোগও, প্রথম হইতেই চিকিৎসিত হইলে সারিবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এই রোগ দীর্ঘ দিন থাকিলে নানা-প্রকার গুরুতর পরিণতি হইতে পারে। হাত, পা, আঙুল, প্রভৃতি বিকৃত হইতে পারে। হাত, পা, খোঁড়া হইয়া যাইতে

পারে। কোন কোন অংশ অসাড় বা অবশ হইয়া যাইতেও পারে।

এই রোগের কোন নিশ্চিত ঔষধ (Specific) এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্প্রতি কর্টিসোন, এ. সি. টি. এচ. প্রভৃতি এবং ইহাদেরই হইতে প্রস্তুত কয়েকটি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, তবে এই ঔষধগুলির সুষ্ঠু ব্যবহার অতীব কঠিন এবং ইহাদের ফলও স্থায়ী নহে। কোন কোন ঔষধের প্রস্তুতকারকেরা ঔষধের ব্যবহার-বিধির সহিত স্পষ্টই লিখিয়াছেন, এই ঔষধের ফল স্থায়ী নয়। এই সকল ঔষধের ব্যবহারে শরীরের অন্য কোন প্রকার ক্ষতি যে হইবে না, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। হোমিওপ্যাথি মতে এই রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া নিয়মিতভাবে চিকিৎসিত হইলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাময় না হইলেও রোগের বহু উপসর্গের উপশম হয়। এলোপ্যাথিক ঔষধ ক্রমাগত দীর্ঘদিন ধরিয়া ব্যবহারে অনেকপ্রকার বাধা ও অসুবিধা আছে। হোমিওপ্যাথিতে তাহা নাই। তাছাড়া হোমিওপ্যাথির মূলতত্ত্ব এবং রোগনিরাময়বিধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বাতব্যাধিরোগগ্রস্থ ব্যক্তির আহারাদি সম্পর্কে সতর্কতা বিশেষ আবশ্যক। অতিরিক্ত আহার সর্বদা বর্জনীয়। আমিষ আহার বর্জন না করিলেও পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া কর্তব্য। যে সকল খাদ্যে ভিটামিন-বি এবং ভিটামিন-সি আছে, সেই সকল খাদ্য বেশি গ্রহণ করা কর্তব্য। বিবিধ প্রকার শাক-

শব্জি ও বিবিধপ্রকার ফল এই রোগের পক্ষে উপকারী। প্রত্যহ কিছু পরিমাণ পাতি লেবুর রস, মুশোম্বির রস বা বাতাবীলেবুর রস পান করা বিশেষ ফলপ্রদ। অনেক খাদ্য আছে যাহার ভিটামিন রন্ধনের ফলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কোন খাদ্যে কি ভিটামিন আছে, প্রভৃতি বিষয়ে চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লইয়া খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করা কর্তব্য।

অন্যরোগজনিত বাতব্যাধিও বহুপ্রকার। ইহাদের বাহ্য উপসর্গ, লক্ষণ, প্রভৃতি অনেকটা সাধারণ বাতের ন্যায় হইলেও ইহার আক্রমণ ও পরিণতি ঠিক একপ্রকার নহে। প্রমেহ রোগের ফলে অনেক সময়ে বাতরোগের উৎপত্তি হয়। ইহাতে হাঁটু, কব্জি, গোড়ালি, প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই রোগ শিশুর অঙ্গেও সংক্রামিত হইতে পারে এবং সময় মত সুচিকিৎসা না হইলে শিশু বিকলাঙ্গ হইয়া যাইতে পারে। অনেক রোগী প্রমেহাদি রোগের কথা গোপন করিবার চেষ্টা করেন। চিকিৎসকের নিকট কোন কথাই গোপন করা উচিত নয়। রোগ পুরাতন হইয়া গেলে এই প্রমেহজনিত রোগের লক্ষণাদি প্রায় সাধারণ বাতের মতই হইয়া থাকে। চিকিৎসার সময়ে মূল রোগ প্রমেহ এবং পরবর্তী বাতরোগ উভয় বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে।

ফুসফুসের রোগ হইতেও বাতব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। যক্ষ্মারোগে ভুগিবার পর কোন কোন ক্ষেত্রে বাতব্যাধি হওয়া সম্ভব। অনেক সময়ে আমাশয়রোগ হইতে বাতব্যাধি হইয়া থাকে।

এ পর্যন্ত যে বাতব্যাধির বিবরণ দেওয়া হইল, সেগুলি সমগ্র শরীরেরই একটা ব্যাধি। শরীরে বিভিন্ন বিশিষ্ট স্থানে যে ফুলা, বেদনা, প্রভৃতি দেখা দেয়, সেগুলি এই ব্যাপক রোগের লক্ষণ বিশেষ। ইহা ব্যতীত আর একপ্রকার বাত-ব্যাধি আছে, যাহা শরীরের এক একটি বিশেষ অংশে সীমাবদ্ধ, সমগ্র শরীরের সহিত সংসৃষ্ট নয়। হোমিওপ্যাথি মতে এইরূপ ধারণা যুক্তিসহ নয়। হোমিওপ্যাথি মতে শরীরের যে কোন অঙ্গের বা যে কোন অংশের যে কোন রোগই সমগ্র মানুষটির রোগ। চিকিৎসা করিতে হয় সমগ্র মানুষটিকে, শুধু বিশেষ একটি অংশকে নহে। এখানে চিকিৎসার কথা আমাদের মূল বক্তব্য নয়। বাতব্যাধির প্রকারভেদ বর্ণনাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এখন যে প্রকার বাতব্যাধির কথা বলা হইতেছে, তাহাকে অস্ট্রিও-আর্থ্রাইটিস (Osteo-arthritis) বলা হইয়া থাকে। সাধারণত বার্দ্ধক্যই ইহার একটি কারণ। এই রোগে শরীরের বড় বড় গিরা (joint) গুলিই বেশি আক্রান্ত হয়। হাঁটু, কোমর, প্রভৃতি যে সকল বড় বড় গিরা বা joint আছে, সেই সকল স্থানেই এই রোগ বেশি হয়। এই সকল স্থানের মাংসে, অস্থিতে এবং অন্যান্য অংশে ফুলা, বেদনা, শুকাইয়া যাওয়া, শক্ত হইয়া যাওয়া, প্রভৃতি কারণে রোগীর বিবিধ প্রকার কষ্ট হইতে থাকে, এবং গিরাগুলির স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হইতে থাকে। এই ধরণের আর একটি রোগ স্যায়াটিকা। এই রোগে কোমর হইতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত পায়ের নীচের অংশে তীব্র বেদনা

অনুভূত হয়। কোমরের একপ্রকার বাতকে কটিবাত (lumbago) বলা হইয়া থাকে। ইহা অতীব কষ্টদায়ক। সহসা একদিন হয়তো দেখা গেল কোমরে এমন সাংঘাতিক বেদনা হইয়াছে যে সামান্য একটু নড়াচড়াও করা যাইতেছে না। কয়েকদিন এইরূপ থাকিয়া একটু একটু করিয়া বেদনা কমিয়া একেবারে সারিয়া যাইতে পারে বা অল্প অল্প বেদনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে।

এই ধরণের বাতব্যাধিগুলিরও কোন নিশ্চিত ঔষধ নাই। এই সকল ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধে অতি উত্তম ফল পাওয়া যায়। দীর্ঘদিন ব্যবহার করিলে এই ব্যাধি সারিয়াও যাইতে পারে। সাময়িকভাবে বেদনার উপশম করিবার পক্ষে উত্তাপ (সেক), গরম তৈল মালিশ করা, বেদনাক্রান্ত স্থান অল্প অল্প নাড়াচাড়া করা, প্রভৃতি দ্বারা উপকার হইতে পারে। আক্রান্ত অবয়বের উপযোগী অল্প অল্প মৃদু ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। নিয়মিত পরিমিত আহার, প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের কম ব্যবহার, ফল আহারের অভ্যাস প্রভৃতি উপকারী। দেখা গিয়াছে, আর্দ্র আবহাওয়া এবং স্যাঁতসেঁতে বাসস্থান সর্বপ্রকার বাতের পক্ষেই অপকারী। নদীর পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহের মধ্যে যে সকল স্থানে নদীর আর্দ্র বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই সকল স্থানে বাতের উপদ্রব বেশি। সেই নদীর পারেই যে সকল স্থানের দিকে নদীর জলমিশ্রিত বায়ু প্রবাহিত হয় না, সেই সকল স্থানে বাতের প্রকোপ কম। বাতব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে

কখনই স্যাঁতসেতে ঘরে বা জলীয় বায়ুতে বাস করা কর্তব্য নয়।

বিলাসিতার জীবন বাতরোগের সহায়ক। যাঁহারা ভোজন-বিলাসী ও শারীরিক পরিশ্রমে বিমুখ, তাঁহাদের পক্ষে বেশি বয়সে বাতব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা খুব বেশি। যাঁহারা নিয়মিত ও পরিমিত আহার করেন, পরিমিত শারীরিক পরিশ্রম করেন, শুষ্ক আবহাওয়া এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাস করেন, তাঁহাদের এই রোগ খুব কম হয়।

ক্যানসার

ক্যানসার একপ্রকার দূষিত ক্ষত। এই ক্ষত অন্যান্য প্রকার সাধারণ ক্ষতের মত নহে। অন্যান্য ক্ষতগুলি যে উপায়ে এবং যে ঔষধে সারে, ক্যানসার তাহাতে সারে না। শরীরে কোনপ্রকার রোগ হইলে সাধারণতঃ তুইটি লক্ষণের যে কোন একটি বা একসঙ্গে তুইটি লক্ষণই প্রকটিত হইয়া থাকে। এই তুইটি লক্ষণ হইতেছে বেদনা এবং জ্বর। যাহাতে জ্বরও নাই, বেদনাও নাই, এরূপ রোগের সংখ্যা অতি অল্প। ক্যানসারের প্রথম অবস্থায় এই তুইটি লক্ষণের কোনটিই থাকে না। সেইজন্য ক্যানসার হইবার অব্যবহিত পরেই ইহা সাধারণত ধরা পড়ে না। এই রোগের ফলে যখন শরীরে অন্যপ্রকার কষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন এই রোগ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। যেমন, অন্ত্রে ক্যানসার হইলে, প্রথমে উহা বুঝা যায় না। যখন ইহার ফলে অন্ত্রের ওই স্থানের ভিতর দিয়া খাদ্য বা মল চলাচলের ব্যাঘাত হয়, তখন ক্যানসার সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কোন ক্ষত ক্যানসার কি না তাহা নির্ণয় করা সব সময়ে সহজ নহে। তবে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থায় ইহার সঠিক নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, রোগ যখন প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল, তখন উহা ধরা পড়ে নাই। যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন উহা চিকিৎসার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্যানসার রোগ হইতে পারে। যে

সকল স্থানে ক্যানসার হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে অন্ত্রের কোলন নামক অংশ একটি। নারী ও পুরুষ উভয়েরই এই স্থানে ক্যানসার হইতে পারে। ইহাও একটি অধিক বয়সের রোগ। অল্পবয়সে সাধারণত এই অসুখ হয় না। কোলন ব্যতীত অন্ত্রের অন্যান্য অংশেও এই রোগ হইতে পারে। আহারাদির বিশেষ অত্যাচার বা অনিয়ম ব্যতীত যদি অকারণ অন্ত্রের মধ্যে অস্বাভাবিক উপসর্গ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অন্ত্রে কোন গুরুতর রোগ হইয়াছে। যদি ক্যানসার হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দিবে এবং কালক্রমে মলনিঃসরণই বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে। এই সাংঘাতিক লক্ষণ ব্যতীত অন্য বহুপ্রকার লক্ষণও ক্রমশ প্রকটিত হইতে পারে। বেদনা, সাধারণ দুর্বলতা, পেটের নানাস্থানে বিবিধপ্রকার অস্বাভাবিক অনুভূতি, প্রভৃতি লক্ষণ থাকিতে পারে। অনেক সময়ে অন্ত্রের মধ্যে অর্বুদ (tumour) জন্মে। রোগ সত্যই ক্যানসার কি না, তাহা রক্ত পরীক্ষা, মল পরীক্ষা, এক্স্‌রে-পরীক্ষা, প্রভৃতি দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়।

যকৃতে ক্যানসার হইলে, তাহার ফলে সাংঘাতিক অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। অনেক সময়ে পিত্তনিঃসরণের পথ অবরুদ্ধ হইয়া পাণ্ডু বা কামলা (jaundice) রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। পিত্তপাথুরী রোগ দীর্ঘদিন স্থায়ী হইলে, তাহা হইতেও ক্যানসারের উদ্ভব হইতে পারে।

ফুসফুসেও ক্যানসার হইতে পারে। এই সকলস্থানে ক্যানসার হইলে তাহার চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন হইয়া

পড়ে। পাকস্থলীতে এবং খাদ্যনালীতেও ক্যানসার হইয়া থাকে। খাদ্যনালীতে যে ক্যানসার হয়, তাহা গলা হইতে আরম্ভ করিয়া পাকস্থলী পর্যন্ত যে কোন স্থানে হইতে পারে। গলদেশের ক্যানসারের রোগীর সংখ্যা খুব বেশি। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গলদেশের ক্যানসারেই ইহলোক ত্যাগ করেন। কবি রজনীকান্ত সেনও গলদেশের ক্যানসারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। গলার, ফুসফুসের বা অন্যান্য স্থানের ক্যানসার সাধারণত অধিক বয়সেই হইয়া থাকে। অনেক সময়ে এক্স্‌রে ব্যবহারের ফলে ক্যানসার উৎপন্ন হইতে পারে। Price-এর Medicine হইতে জানা যায়—১৮৯৫ সালে Rontgen কর্তৃক এক্স্‌-রে আবিষ্কৃত হয়। তাহার পর হইতেই এই রে'র বিবিধ কুফলের কথা নানাভাবে প্রকাশ পায়। যতদূর জানা যায়, ১৯০২ সালে প্রথম এক্স্‌-রে-জনিত ক্যান-সারের রোগী দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা এক্স্‌-রে বিষয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা, যন্ত্রাদি প্রস্তুত, প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও এক্স্‌-রে-জাত ক্যানসার রোগ হইতে পারে। বর্তমান কালে বিবিধ প্রতিষেধকের ব্যবস্থা হওয়ায়, এইরূপ ঘটনা কমিয়া গিয়াছে। হাতে এবং গায়ের চর্মে বিবিধ উপসর্গ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত এক্স্‌-রে ব্যবহারজনিত যে চর্মরোগের উদ্ভব হয়, তাহা অতি কঠিন। Deep X-ray therapy ব্যবহারের ফলে অত্যন্ত ভয়ানক ধাতুগত (constitu-tional) উপসর্গ সমূহ আসিয়া জুটিতে পারে। বমনের উদ্বেগ, অসহ্য বমন, উদরাময়, উদরে বেদনা, জ্বর, ভীষণ দুর্বলতা,

হৃদ্‌যন্ত্রের বৈকল্য, প্রভৃতি গুরুতর লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে পারে।

ক্যানসার রোগের চিকিৎসা অতীব কঠিন। এ সম্পর্কে আধুনিক তথ্য জানিতে হইলে ক্যানসার বিষয়ক আধুনিক পুস্তকাদি পাঠ করা আবশ্যক। বিখ্যাত ক্যানসার-বিশেষজ্ঞ ডাঃ E. H. Smallpage, M. B., Ch. M. (Syd.), F. R. C. S. (Eng.) লিখিত Cancer : Its Cause, Prevention and Cure নামক পুস্তক হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি।

ক্যানসার রোগের মূল কি ? একটি caustic খনিজ লবণ। ইহাতে রক্তের অবস্থা এইরূপ : Carbonates-এর আধিক্য, Phosphates এবং Chlorides এর ন্যূনতা, Oxyhoemoglobin-এর স্বল্পতা। মূত্রের অবস্থা : Urinary Carbonates এর আধিক্য এবং Urinary Phosphates এবং Chlorides-এর অভাব।

ক্ষুদ্রান্ত্রে (Small intestines) ক্যানসার হয় না বলিলেই হয়।

ক্যানসার রোগ দ্বারাই মৃত্যু সংঘটিত হয় না। তবে ক্যানসার রোগের ফলে অন্যত্র অসঙ্গত চাপ বা রক্তপাত দ্বারা শরীরের প্রাণধারক প্রক্রিয়া ব্যাহত হইলে মৃত্যু ঘটিতে পারে।

ক্যানসারের কারণ রক্তের carbonate. ইহার অপসারণই ক্যানসার রোগ সারিবার প্রকৃত পন্থা।

The removal of the blood carbonates....is alone

possible by medical measures which replace the carbonates by chlorides aud phosphates. That is by the provision to the cancerous body of the free acid radicals of chlorides and phosphates. These are called buffer salts.

Cancerous growths, cysts and fibroid growths are all manifestations of the universal sodium habit of mankind. আমেরিকার লোকের sodium habit বেশি। তাহারা সোডা, লেমনেড, প্রভৃতি অত্যন্ত বেশি খায়, সেইজন্য তাহাদের ক্যানসার বেশি হয়, এইরূপ একটা ধারণা আছে।

শরীরের টিস্যুতে carbonates আছে বলিয়াই রেডিয়াম এবং এক্স্-রে দ্বারা তাহারা প্রভাবান্বিত হইয়া কার্যকরী হয়। রেডিয়াম ও এক্স্-রে ব্যবহার না করিয়াও যেখানে ক্যানসার হইয়াছে, তাহার চারিপাশে dilute caustic mineral salts ইন্‌জেক্‌শন করিয়া ঠিক এই ফলই পাওয়া যায়।

Deep X-Ray therapy দ্বারা চিকিৎসিত রোগীরা, বমন, গুরুতর শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, প্রভৃতি উপসর্গে কষ্ট পাইয়া থাকে। তাহাদের মনে হয় যেন সমস্ত শরীরে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। শরীরের কোন একটি বিশেষ স্থানে caustic-এর ক্রিয়া নিবারণ করিবার জন্য সমস্ত শরীরে caustic উৎপাদন করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। X-Rays convert the carbonates circulating in the cancer victims' blood and tissue fluids into caustic

mineral salt and the body tissues are burnt. Protein destruction occurs, uric acid is formed, and these combine with the caustic mineral salts to form urates.

ক্যানসার হইয়াছে কি না জানিবার পক্ষে রক্ত ও মূত্রের carbonate test অতি নিশ্চিত ও মূল্যবান উপায়।

ক্যানসার রোগীর পক্ষে প্রয়োজন—Complete abstinence from all foods, drugs, etc, preserved, cooked or impregnated with chemicals, mainly those of soda. Increased removal of blood carbonate, by increased excretions through skin, kidneys and intestinal tract.

এই ব্যাধিতে Condurango বা Cundurango নামক ঔষধে (মূল আরক বা ডাইলিউশন) খুব ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে।

ডাঃ স্মলপেজের মতামতগুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। ডাঃ স্মলপেজ হোমিওপ্যাথির একজন ভক্ত।

হৃদ্‌যন্ত্র

আমরা যখন যে বাড়ীতে বাস করি, তাহার কোনরূপ মেরামত আবশ্যক হইলে অবশ্য উপযুক্ত মিস্ত্রীরাই তাহা করিয়া থাকে। তথাপি বাড়ীর বিভিন্ন উপাদান, যেমন, ইট, কাঠ, চূণ, সুরকি, প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকিলে বাড়ীর তত্ত্বাবধান এবং মেরামতের তত্ত্বাবধানে কিছুটা সুবিধা হয়। যাঁহাদের গাড়ী আছে, তাঁহাদের যদি গাড়ীর সম্পর্কে মোটামুটি কতকগুলি তথ্য জানা থাকে, তাহা হইলে গাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত মিস্ত্রী দ্বারা মেরামত, প্রভৃতি ব্যাপারে কিছুটা সুবিধা হয়। তেমনি, আমাদের শরীরে কোন অসুখ হইলে অবশ্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে। তথাপি শরীরের বিভিন্ন অবয়ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান থাকিলে স্বাস্থ্যরক্ষা এবং সুচিকিৎসা উভয়পক্ষেই সুবিধা হয়। গাড়ীর পক্ষে, উহার এঞ্জিন কেমন করিয়া চলে, রেডিয়েটরে জল না দিলে কি হয়, কারবুরেটর কাহাকে বলে, ডিস্ট্রিবিউটর জিনিষটা কি, হাইড্রলিক ব্রেক কিরূপ, এঞ্জিন সাধারণতঃ কি কারণে নক (knock) করে, গীয়ার মানে কি, প্লাগ কি, প্রভৃতি অতি স্থূল কতকগুলি বিষয় সকলেরই জানা উচিত। তেমনি আমাদের এই শরীরযন্ত্রটা সম্পর্কেও মোটামুটি একটা ধারণা থাকা সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। শরীরের মধ্যে হাড়,

মাংস, চর্বি, রক্ত, শিরা, স্নায়ু, প্রভৃতি অসংখ্য বিভিন্ন অংশ ও উপাদান রহিয়াছে। এইগুলি সম্পর্ক মোটামুটি একটা ধারণা বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় পুস্তক হইতে পাওয়া যাইবে। এখানে আমরা শরীরযন্ত্রের মূলকেন্দ্র এবং প্রাণশক্তির সাক্ষাৎ বাহক হৃদ্‌যন্ত্রের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

হৃদ্‌যন্ত্রটি যেন শরীরের এঞ্জিন। ইহার বলেই শরীর জীবিত থাকে। গাড়ীর এঞ্জিন সর্বদা চলে না, কখনো চলে, কখনো বন্ধ থাকে। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের বিশ্রাম নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অবিরত ইহা স্পন্দিত হইতেছে। মাতার জঠরে মানুষের ভ্রূণরূপধারণ করিবার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত এক সেকেণ্ডও ইহার বিশ্রাম নাই। হৃদ্‌যন্ত্রের বিরাম বা বিশ্রামের অর্থই মৃত্যু। একবার ইহার স্পন্দন বন্ধ হইলে কাহারও সাধ্য নাই, ইহাকে আবার চালু করে। সমগ্র পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক শক্তি সম্মিলিত হইয়াও ইহাকে আর সচল করিতে পারিবে না।

হৃদ্‌যন্ত্রটি আমাদের বুকের মাঝখানে একটু বাঁদিকে অবস্থিত। সাধারণ ভাষায় এবং সাহিত্যে এই যন্ত্রটি সম্পর্কে একটা বিষম ভুল ধারণা আছে। দয়া, মায়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, প্রভৃতি গুণগুলির উৎস বুকের মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা আছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এগুলি সবই মস্তিষ্কের ব্যাপার। কবি বলেন, হৃৎকমলের রাঙা রেণু রঙাবে ওই উত্তরীয়। বুকের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কমল-টমল রেণু-

টেন্থ কিছুই নাই। ওগুলি মস্তিষ্কের কল্পনা। রামভক্ত বীর হনূমানের বুকের মধ্যে রামসীতা বিরাজ করেন, এইরূপ ধারণা অনেকের আছে। কিন্তু বীর হনূমানের বুক চিরিলে সেখানে রামসীতার পাত্তা পাওয়া যাইবে না। বরঞ্চ উহার মাথার খুলিটা ভাঙিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে ছুরি বসাইয়া দিলে হয়তো সেখানে উঁহাদের কতকটা সন্ধান মিলিতে পারে।

মস্তিষ্কের সহিত শরীরের সমস্ত অঙ্গেরই যোগাযোগ আছে। সেইজন্য মস্তিষ্কের মধ্যে কোন ভাবের উদয় হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া বিবিধ অবয়বে পরিদৃষ্ট হয়। ভয় হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুত হয়, কিন্তু ভয়ের উৎস হৃৎপিণ্ড নয়। মস্তিষ্কেই উহার উদ্‌ভব। অত্যধিক আনন্দে বা অত্যধিক ভয়ে, বা অন্য প্রকার মানসিক উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সকল মানসিক উত্তেজনার মূল মস্তিষ্কে, হৃৎপিণ্ডে নহে। আমরা qualities of head and heart বলিয়া থাকি। জ্ঞান, বুদ্ধি, কল্পনা, প্রভৃতি qualities of head এবং দয়া, সহানুভূতি, পরার্থে স্বার্থত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, প্রভৃতি qualities of heart এইরূপ ধারণা প্রচলিত। কিন্তু heart বা হৃৎপিণ্ডের ঐরূপ কোন quality নাই। সমস্ত শরীরে অনবরত রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়ারত এই স্বয়ংক্রিয় অদ্ভুত পাম্পটির মধ্যে রক্ত, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি সবই আছে, কিন্তু দয়া, মায়া, প্রভৃতি কোন গুণ নাই।

এইবার হৃৎপিণ্ডের গঠনের একটু বিবরণ দেওয়া যাক। হৃৎ-পিণ্ডটি লম্বালম্বি দুইভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের মধ্যে কোন

যাতায়াতের পথ নাই। এক একটি অংশ আবার আড়াআড়ি দুই ভাগে বিভক্ত—উপরে একভাগ এবং নীচে একভাগ। মোট এই চার ভাগের নাম right auricle (উপরের ডানদিকের খোপ), left auricle (উপরের বাঁদিকের খোপ) right ventricle (নীচের ডানদিকের খোপ) এবং left ventricle (নীচের বাঁদিকের খোপ)। উপর-নীচের খোপের মধ্যে valve (একমুখী দরজা) আছে। হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন ও সম্প্রসারণের ফলে যেরূপ রক্তচলাচল হয় তাহা মোটামুটি এইরূপ: দূষিত রক্ত একটি ধমনী দিয়া right auricle-এ প্রবেশ করে। এখান হইতে valve-এর মধ্য দিয়া right ventricle-এ প্রবেশ করে। সেখান হইতে এই রক্তস্রোত pulmonary artery এর ভিতর দিয়া ফুসফুসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে। সেখানে আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে যে টাটকা বায়ু গ্রহণ করি তাহার দ্বারা এই দূষিত রক্ত শোধিত হইয়া বিশুদ্ধ রক্তে পরিণত হয়। এই বিশুদ্ধ রক্ত pulmonary vein এর ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ডের left auricle-এ ফিরিয়া আসে। সেখান হইতে left ventricle-এর ভিতর দিয়া aorta নামক শিরার ভিতর দিয়া এবং পরে ইহার বিবিধ শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। এইরূপ ব্যাপ্তিতে ক্রমশ সূক্ষ্ম হইতে সুক্ষ্মতর শিরাসমূহের মধ্য দিয়া শেষে capillaries এর মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে শরীরের বিবিধ প্রকার ক্লেদ বহন করিয়া খানিকটা দূষিত হইয়া আর এক শ্রেণীর capillaries এর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশ

দূষিত রক্তের ধমনী বাহিয়া হৃৎপিণ্ডে right auricle-এ প্রবেশ করে। তারপর আবার উক্ত প্রকার ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহাই হইল একটি মোটামুটি বিবরণ। ষ্টীম-এঞ্জিন কেমন করিয়া চলে বুঝাইতে হইলে আমরা সংক্ষেপে বলি, জল গরম করিলে বাষ্প হয়, সেই বাষ্পের চাপের বলে পিস্টন চলিয়া চাকা ঘোরায়। কিন্তু ইহার ব্যবস্থা করিতে কতপ্রকার আয়োজন করিতে হয়! তেমনি হৃৎপিণ্ডের উক্ত প্রকার কার্যের সুব্যবস্থার জন্য বহু আয়োজন, বহু কলকৌশল প্রয়োজন হইয়াছে। সেইগুলির বিস্তৃত বর্ণনা এখানে সম্ভব নয়। পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে।

এই রক্তপ্রবাহ হৃদ্‌যন্ত্রের সংকোচন ও সম্প্রসারণ দ্বারা সম্পাদিত হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের উপরের দুইটি auricle-এর সংকোচন ঠিক একই সময়ে হয়, ইহার পরই হয় নীচের ventricle-দুইটির সংকোচ। এই সংকোচকে বলে systole. সংকোচনের পর যে সম্প্রসারণ আসে তাহাকে বলে diastole, একটি সংকোচন এবং একটি সম্প্রসারণ লইয়া একটি cycle সম্পূর্ণ হয়। একটি পূর্ণ cycle-কেই আমরা সাধারণ কথায় একটি heart beat বা নাড়ীর স্পন্দন বলি। মিনিটে সাধারণত ৭২টি স্পন্দন হয়, অর্থাৎ এক একটি স্পন্দনের সময় প্রায় পৌনে এক সেকেণ্ড। বুকের সঙ্গে কান লাগাইলে বা ষ্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্র লাগাইলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনজনিত শব্দ শোনা যায়। এক একটি শব্দ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশটা সিস্টলিক বা সংকোচজনিত এবং একটু দীর্ঘস্থায়ী। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সম্প্রসারণজনিত

অংশটি আরও স্বল্পক্ষণস্থায়ী। দুইএ মিলিয়া যে শব্দটি হয়, তাহাকে সুবিধার জন্য লাব্-ডাপ্ বলা হয়। হাতের কব্জিতে যে নাড়ীর (pulse) স্পন্দন অনুভব করা যায়, তাহার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত শব্দের প্রথমাংশ এবং ঠিক অব্যবহিত পরে দ্বিতীয়াংশ শোনা যায়।

হৃৎপিণ্ডটিকে ঘিরিয়া একটি থলি আছে, তাহাকে পেরি-কার্ডিয়াম (pericardium) বলে। হৃৎপিণ্ডটির সাইজ আমরা হাত মুট করিলে যতটা হয়, অনেকটা তত বড়। তবে বয়স বিশেষে এবং অবস্থাবিশেষে ইহা অপেক্ষা বড়ও হইতে পারে। ইহার ওজন ২৮০ হইতে ৩৪০ গ্রাম হইতে পারে। স্ত্রীলোকের হৃৎপিণ্ড একটু ছোট। ইহার ওজন ২৩০ হইতে ২৮০ গ্রাম হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের বাহিরের দিকে একটি পর্দা আছে, তাহার নাম এপিকার্ডিয়াম (epicardium)। ইহার ভিতরের দিকের পর্দার নাম এণ্ডোকার্ডিয়াম (endo-cardium)। এই দুই পর্দার মাঝখানে যে মাংসল পদার্থ, তাহাকে মায়োকার্ডিয়াম (myocardium) বলে। হৃৎপিণ্ডের সর্বনিম্ন অংশকে অ্যাপেক্স্ (apex) বলে। এটা হৃৎপিণ্ডের নীচের দিককার ডগা। ইহার অবস্থান হৃৎপিণ্ডের বাম ভেণ্ট্রিক্-লের ঠিক নীচে। এই ডগায় যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহাকে অ্যাপেক্স্-বিট (apex-beat) বলে। হৃৎপিণ্ডের বিবিধ রোগনির্ণয়ে এই অ্যাপেক্স্-বিটের গতি ও প্রকৃতির তথ্য জানিতে হয়।

হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা এবং সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটা

মোটামুটি ধারণা করিবার পক্ষে পরিশ্রম-পরীক্ষাই সহজতম উপায়। কোন অস্বাভাবিক পরিশ্রম করিলে, যেমন, জোরে দৌড়ান, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া ওঠা, শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতি, হৃৎপিণ্ড অত্যন্ত দ্রুত চলিতে থাকে। সুস্থ শরীরে এই অতি দ্রুত স্পন্দন দুই তিন মিনিটের মধ্যেই শান্ত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। কিন্তু দুর্বল বা রুগ্ন হৃৎপিণ্ড এত শীঘ্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত তো হয়ই না, তৎসঙ্গে শরীরে অন্যান্য উপসর্গও আসিয়া জোটে। কোন কাজ বা পরিশ্রম না করিলেও এবং ঘুমাইয়া থাকিলেও রক্ত-চলাচল অব্যাহত রাখিবার জন্য হৃৎপিণ্ডকে খানিকটা শক্তি প্রয়োগ করিতেই হয়। এই শক্তিকে বিশ্রাম-শক্তি (rest force) বলা যাইতে পারে। কোন কাজ বা পরিশ্রম করিতে যে অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহাকে সঞ্চিত শক্তি (reserve force) বলা যাইতে পারে। এই দুই প্রকার শক্তি অত্যধিক হ্রাস পাইলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইয়া মৃত্যু ঘটে।

কাহারও হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়া বা দুর্বলতা হইলেই তাহার নানা প্রকার লক্ষণ প্রকটিত হইতে থাকে। প্রধান লক্ষণ এই যে সুস্থ অবস্থায় এই ব্যক্তি যে শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন, হৃদ্‌রোগের আক্রমণের পর তাহা পারেন না। হৃদ্‌রোগের শেষ অবস্থা হৃৎস্পন্দনের বিরতি বা মৃত্যু। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অবস্থা সহসা না আসিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আসে, এবং এই রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

নানাপ্রকার কষ্টকর উপসর্গ আসিয়া জুটিতে থাকে। শ্বাসকষ্ট, অত্যধিক শ্রমকাতরতা, বুক ধড়ফড় করা, পেরিকার্ডিয়ামে বেদনা, মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হইয়া যাওয়া, বুকের উপর চাপ-বোধ প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সকল উপসর্গ অবশ্য অন্য কারণেও কখনও কখনও হইতে পারে। তবে কিছুদিন সাবধানে লক্ষ্য করিলেই প্রকৃত কারণ বুঝিতে কষ্ট হয় না।

হৃদ্‌যন্ত্রের পীড়ার উপসর্গসমূহ সাধারণত রাত্রিতে বাড়ে। অনেক সময়ে রোগীকে শ্বাসকষ্টের জন্য বিছানায় উঠিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। সাময়িক ভাবে খানিকক্ষণ শ্বাসরোধ কষ্ট হইয়া অনেক সময়ে আপনা-আপনি তাহা কমিয়া যায়। এই ধরণের হাঁপানিকে কার্ডিয়াক অ্যাজমা (cardiac asthma) বলা যায়। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার বৈকল্যহেতু অনেক সময়ে বিভিন্ন প্রকার শোথ দেখা দেয়। তবে এই উপসর্গ রোগের প্রথম দিকে দেখা দেয় না। এই ফুলা প্রথমত শরীরের নীচের দিকে পায়ে আরম্ভ হয় এবং ক্রমশ উপরের দিকে উঠিতে উঠিতে সমস্ত শরীরে বিস্তৃতিলাভ করে। তখন অবস্থা খুব কঠিন হইয়া পড়ে। হৃদ্‌রোগে নাড়ীর স্পন্দন (pulse) দুর্বল ও ক্ষীণ হইতে থাকে। যে সকল লক্ষণের কথা বলা হইল, এই সকল লক্ষণ একই সময়ে না হইতে পারে এবং ইহাদের তীব্রতাও সমান নয়। তবে এটা ঠিক যে, হৃদ্‌রোগের প্রারম্ভে উক্ত লক্ষণসমূহ মৃদু আকারে প্রকাশ পায় এবং রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণগুলি তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে। এই সকল

লক্ষণের তীব্রতা হইতেই অনেক হৃদ্‌রোগের অবস্থা মোটামুটি জানা যায়। বর্তমান যুগে ইলেক্ট্রোকার্ডিয়োগ্রাম (electro-cardiogram) নামে যে যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্য ও রোগের বিভিন্ন অবস্থা সুষ্ঠুরূপে নির্ণয় করা যায়।

হৃদ্‌রোগের সূত্রপাত হইলেই রোগী স্বভাবতই অত্যন্ত বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। কিন্তু ইহাতে কোন লাভ নাই। সুচিকিৎসা এবং সুপথ্যের ব্যবস্থা করা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মত জীবনযাপন করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অতিরিক্ত উদ্বেগ করিলে, এই উদ্বেগের ফলেই হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষতি হইতে পারে। বাহ্য কোন কারণে ভয়ের সঞ্চার হইলে যেমন তাহাতে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বৃদ্ধি করে এবং অযথা হৃদ্‌যন্ত্রের উপর চাপ পড়ে, তেমনি নিজের অসুখ সম্পর্কে অত্যধিক উদ্বেগ করিলেও হৃদ্‌যন্ত্রের সেইরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। হৃদ্‌যন্ত্রই আমাদের শরীরের মৌলিক যন্ত্র। সুতরাং ঐ যন্ত্রটির অসুস্থতা মোটের উপর গাড়ী থামিবার distant signal-এর মত। তাই বলিয়া অতিরিক্ত পরিমাণে ভীত হইয়া লাভ কি হইবে? বরঞ্চ, আমরা সাংসারিক কাজে ডুবিয়া যে অপরিহার্য মৃত্যুর কথা একেবারে ভুলিয়া যাই, সেই মৃত্যু যে আসিতেছে, সত্বরই হউক বা বিলম্বেই হউক, এই জ্ঞান মানুষের পক্ষে সব সময়ে খুব অনিষ্টকর নহে। মৃত্যু তো হইবেই। কলেরা, টাইফয়েড, দুর্ঘটনা প্রভৃতি কারণে যে মৃত্যু দ্রুত ঘটিয়া যায়, হৃদ্-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরও ঠিক সেই মৃত্যুই ঘটিবে, হয়তো কিছু দিন পরে।

হৃদ্‌যন্ত্র সম্বন্ধে যেটুকু বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্থূলকায় ব্যক্তিরা কেন দীর্ঘায়ু হন না। শরীরটিকে উপযুক্ত রক্তপ্রবাহ দ্বারা সঞ্জীবিত রাখা এবং ইহাকে নানাস্থানে চালিত করা, ইহাকে দিয়া অল্প বা অধিক শ্রমসাধ্য কাজ করান প্রভৃতি সকল প্রকার কার্যের জন্য যে শক্তি প্রয়োজন, তাহার উৎস এই হৃৎপিণ্ড। সুতরাং স্থূলকায় ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড এই সকল কাজ করিতে করিতে সহজেই দুর্বল হইয়া পড়িবে, ইহাই স্বাভাবিক। একটি বেবি-অস্টিনের এঞ্জিন দিয়া একটি তিন-টন লরী হয়তো চালান যায়, কিন্তু অতি সাবধানে চালাইলেও কিছুদিন পরেই উহা অকর্মণ্য হইয়া যাইবে। তাছাড়া মেদবহুল শরীরে হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যেও মেদ জমে, এবং তদ্দ্বারা হৃৎপিণ্ডের বল স্থিতিস্থা কতা এবং স্পন্দনশক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সর্বদাই সাধ্যাতিরিক্ত কাজ করিতে হয় বলিয়া অনেক সময়ে হৃৎপিণ্ডের আকারও বড় হইয়া যায়। ইহাকে dilatation of the heart বলে। ব্যায়ামবীরদের হৃৎপিণ্ডের আকার সাধারণ আকার অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে।

যে কোন প্রকার হৃদ্‌রোগে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন বিশ্রাম। যত বেশি বিশ্রাম করা যাইবে, ততই হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়া সহজ হইবে। রোগীর পেশা, তাহার দৈনন্দিন অভ্যাস, তাহার ঘুমের সময়, তাহার মানসিক শান্তি ও অশান্তি প্রভৃতি সকল বিষয়ের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ দিতে হইবে। সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা করিয়া বেশিদিন রাখা কর্তব্য নয়, তাহাতে তাহার মানসিক উদ্বেগ, ভয় প্রভৃতি

বাড়িতে পারে। তাহার সমগ্র সত্তাটিকে ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া যাহাতে তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের প্রতি সর্বাপেক্ষা কম চাপ পড়ে, তাহা করিতে হইবে। রাত্রে নয় দশ ঘণ্টা ঘুম, আহারের পর একটু বিশ্রাম, যে ব্যায়ামে নিজেকে পরিশ্রম করিতে হয় না সেইরূপ ব্যায়াম (যেমন, মাসাজ) প্রভৃতি অবস্থা বিশেষে বিশেষ উপকারী। মন যাহাতে অযথা ভারাক্রান্ত না হয়, কাজ যাহাতে সাধ্যাতিরিক্ত না হয়, যাহা না করিলেও চলে, এরূপ কাজ যাহাতে পরিহার করা হয় প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। যে রোগী যাহাতে আনন্দ পান, সেইরূপ আনন্দের কিছু কিছু ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়।

যাঁহাদের কোনরূপ হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতা বা রোগ আছে, তাঁহাদের খুব বেশি জল খাওয়া উচিত নয়। ঝোল-জাতীয় খাদ্য না খাইলেই ভাল হয়। এক সঙ্গে বেশি আহার কর্তব্য নয়। বরং বার বার অল্প অল্প করিয়া খাওয়া ভাল। আহার লঘু হওয়া উচিত। গুরুপাক দ্রব্য ভোজন কর্তব্য নয়। গুরুপাক দ্রব্য ভাল করিয়া পরিপাক করিয়া অঙ্গীভূত করিতে হৃদ্‌যন্ত্রের পরিশ্রম হয়। লবণ কম খাওয়া ভাল। বি এবং সি ভিটামিন-যুক্ত খাদ্য উপকারী। তামাক, সিগারেট, কফি বা অন্য কোন প্রকার তীব্র আহার বা পানীয় বর্জন করিলেই ভাল হয়। যাহাতে কোষ্ঠবদ্ধতা না থাকে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

সাধারণত সুস্থ অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দন বুঝা যায় না। সহসা বেশি পরিশ্রম করিলে (যেমন দৌড়াইলে) আমরা এই

স্পন্দন বুঝিতে পারি। এই অস্বাভাবিক স্পন্দন বেশিক্ষণ থাকে না। একটু পরে আর কোন স্পন্দন অনুভব করা যায় না। তবে হৃদ্‌রোগ হইলে, সর্বদাই এই স্পন্দন অনুভূত হইতে থাকে। ইহাকে স্পন্দন-সচেতনতা (heart-consciousness) বলা যায়। ইহাই বোধ হয় হৃদ্‌রোগের সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য এবং গুরুতর লক্ষণ। এই স্পন্দন-সচেতনতা সহজে দূর হয় না। শরীরের অন্য অনেক অঙ্গের শক্তি কোন কোন প্রকার ব্যায়াম দ্বারা বৃদ্ধি করা যায়। যেমন, বিবিধ প্রকার ভার উত্তোলনের ব্যায়াম করিতে করিতে হাতের এবং অন্যান্য পেশির বল বৃদ্ধি করা যায় এবং ক্রমশ অনেক বেশি ভার উত্তোলন করা যায়। কিন্তু পীড়িত বা দুর্বল হৃৎপিণ্ডটি সেরূপ নহে। ইহাকে বেশি ব্যবহার করিয়া বা বেশি শ্রমসাধ্য কার্যে নিযুক্ত করিয়া ইহার বল বৃদ্ধি করা যায় না।

অনেক সময়ে হৃদ্‌রোগকে অর্গানিক এবং ফাংশন্যাল, এই দুই প্রকারে ভাগ করা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের নিজস্ব অবয়বে কোন প্রকার রোগ বা বৈকল্য হইলে যে রোগ জন্মে, তাহাকে অর্গানিক (organic) এবং যন্ত্রটিতে কোন বিশেষ রোগ না থাকিলেও রক্তপ্রবাহ প্রভৃতির গোলযোগের জন্য যে হৃদ্‌রোগের আবির্ভাব হয়, তাহাকে ফাংশন্যাল (functional) বলা হয়। হৃদ্‌রোগ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হইলে প্রায়ই উহার একটি হইতে অপরটির উদ্ভব হয় এবং কিছুকাল পরে এক সঙ্গে দুইটিরই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। যদি অন্য কোন গুরুতর উপসর্গ না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ বুক ধড়ফড় করা বা

বুকের মধ্যে হৃদ্‌যন্ত্রের কাছে অল্প অল্প বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ সাধারণ ফাংশন্যাল রোগেরই লক্ষণ।

মোট কথা, হৃদ্‌যন্ত্রটিকে প্রাণযন্ত্র বলা যাইতে পারে। হৃদ্‌যন্ত্র অচল হওয়ার নামই মৃত্যু। সুতরাং ইহার সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও সাবধানতা আবশ্যক। আমরা অনেক সময়ে শুনি, অমুক সহসা হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছেন। এটা যেন একটা অ্যাকসিডেণ্ট—গাড়ী চাপা পড়িয়া মৃত্যুর মত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে, তিনি অন্ততপক্ষে দশ, পনের বা বিশ বৎসর যাবৎ কোন না কোন প্রকার হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন। হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া অসম্ভব একথা বলিতেছি না, তবে সাধারণত আমরা যে সকল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার সংবাদ পাই সেই সকল রোগীর কথাই বলিতেছি।

খাদ্য

আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার দ্বারাই আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষা হইয়া থাকে। মানুষ যতদিন পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তাহার শরীরের বিভিন্ন অবয়ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই বয়স পর্যন্ত আহার্যের প্রয়োজনও বেশি হয়। তাহার পর আহার্যের পরিমাণ ক্রমশ কম হইয়া আসে। বেশি বয়সে আহার্য দ্বারা শুধু ক্ষয় পূরণের কার্য সমাধা হইয়া থাকে।

মানুষের খাদ্যের জন্য বিবিধ প্রকার দ্রব্যের প্রয়োজন। শুধু একটি মাত্র খাদ্যে তাহার চলে না। অতি শৈশবে, অর্থাৎ জন্মের অব্যবহিত পরে শুধু দুগ্ধ দ্বারাই শরীরের যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়া যায়। এইজন্য দুগ্ধকে একটি সম্পূর্ণ খাদ্য বলা হয়। আমাদের খাদ্যে সাধারণতঃ যে সকল পদার্থ থাকে, সেগুলি এই—কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহ, বিবিধ প্রকার লবণ এবং বিবিধ প্রকার ভিটামিন। চাল, আটা বা ময়দা, আলু প্রভৃতি খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট অধিক পরিমাণে বর্তমান। মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতিতে প্রোটিন বেশি আছে। ঘৃত, মাখন, প্রভৃতিতে স্নেহ পদার্থই বেশি। বিবিধ ফল ও তরকারিতে বিবিধ প্রকার লবণ ও ভাইটামিন বেশি আছে। জল প্রায় সব খাদ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে।

শরীরের বিবিধ টিস্যু (tissue) প্রস্তুত করিতে খাদ্যের প্রয়োজন। আমাদের শরীর একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিশেষ। ইহাকে চালু রাখিতে অনেকখানি শক্তি বা energy-রও প্রয়োজন। এই এনার্জিও আসে খাদ্য হইতে। আমাদের শরীরের একটা স্বাভাবিক তাপ আছে। অন্যান্য নির্জীব পদার্থ গরম করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে তাহার তাপ ক্রমশ কমিয়া সন্নিকটবর্তী বাতাসের তাপের সহিত সমতাপ হইয়া যায়, অর্থাৎ জুড়াইয়া যায়। কিন্তু মানুষের শরীর জুড়াইয়া যায় না। মানুষের শরীর একেবারে জুড়াইয়া গেলে তাহার মৃত্যু হয়। শরীরের এই তাপ বজায় রাখিবার জন্য এবং রক্তচলাচল প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাহত রাখিবার জন্য যে এনার্জির প্রয়োজন হয়, তাহা খাদ্য হইতেই আসে। এই তাপ-উৎপাদন শক্তি মাপিবার জন্য ক্যালোরি-নামক একক (unit) ব্যবহৃত হয়। এক কিলোগ্রাম জল ১৬°C হইতে ১৭°C-তে উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, তাহাকে এক ক্যালোরি বলে। কোন খাদ্যের কত পরিমাণে কত ক্যালোরি তাপ উৎপন্ন হয়, তাহা বৈজ্ঞানিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন। এক গ্রাম স্নেহপদার্থে ৯ ক্যালোরি উত্তাপ উৎপন্ন হয়। এক গ্রাম কার্বোহাইড্রেটে ৪ ক্যালোরি, এক গ্রাম প্রোটিনে ৪ ক্যালোরি, এক গ্রাম ষ্টার্চে ৪ ক্যালোরি, এক গ্রাম গ্লুকোজে ৪ ক্যালোরি এবং এক গ্রাম চিনিতে ৪ ক্যালোরির তাপ উৎপন্ন হয়। তাপ উৎপাদন পক্ষে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের মূল্য সমান। স্নেহজাতীয় খাদ্যের তাপ-উৎপাদক শক্তি

বেশি। মানুষ কোন কাজ না করিলেও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে খানিকটা তাপ প্রয়োজন হয়। সেজন্য খাদ্যেরও প্রয়োজন হয়। মানুষ যদি পরিশ্রম করে, তবে তাহার জন্যও এনার্জির প্রয়োজন হয়, এবং সেইজন্য আরো বেশি খাদ্যের আবশ্যক হয়। এইজন্য যাহারা শারীরিক পরিশ্রম বেশি করে, তাহাদের তাপ-উৎপাদক খাদ্যও প্রয়োজন হয় বেশি। আপাততঃ মনে হইতে পারে, যে গরম খাদ্য খাইলে তাহার ক্যালোরিও বেশি হইবে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গরম খাদ্য এবং ঠাণ্ডা খাদ্যের ক্যালোরি-গুণের প্রভেদ অতি সামান্য। তবে অনেক খাদ্যই গরম খাইতে ভাল লাগে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মানুষ শারীরিক ও মানসিক কোনপ্রকার পরিশ্রম না করিলেও, তাহার শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিবিধ অবয়বের ক্রিয়া (যেমন, রক্তচলাচল, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি) এবং শরীরের তাপ অব্যাহত রাখিতে দৈনিক প্রায় ১৬০০ ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন হয় এবং তদনুসারে খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। যাহারা শুধু বসিয়া বসিয়া কাজ করে, তাহাদের ২০০০ ক্যালোরি এবং যাহারা বাহিরে ঘোরা-ফেরা প্রভৃতি শ্রমের কাজ করে, তাহাদের ৩৫০০ ক্যালোরি প্রয়োজন হয়। যদি কেহ অবিরত শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহা হইলে চব্বিশ ঘণ্টায় ১০,০০০ ক্যালোরি প্রয়োজন হইতে পারে।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে যে পদার্থগুলি শরীরের পক্ষে প্রয়োজন, সেগুলি অর্থাৎ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ,

ভিটামিন, লবণ ও জল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পরিমাণে মিশাইয়া বড়ি প্রস্তুত করিয়া তাহারই কয়েক মাত্রা করিয়া সেবন করিয়া আমাদের সাধারণ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা পরিহার করা যায় না। আমাদের শরীরের যন্ত্রগুলি এমনভাবে প্রস্তুত যে, নানাপ্রকার খাদ্য আমাদিগকে খাইতেই হইবে এবং সেই সকল খাদ্য হইতে পাকস্থলী, অন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্র সাহায্যে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এজন্য উক্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ব্যতীত অনেকখানি বাজে খাদ্য (roughage) খাইতে হয়। নতুবা পরিপাক কার্য বা মল নিঃসরণ কার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না। গরু এবং অন্যান্য প্রাণীর পক্ষেও ইহা সত্য। গরুকে চুনি, ভূষি, খইল প্রভৃতি খাদ্যের সহিত প্রচুর পরিমাণে বিচালি দিতে হয়। অথচ বিচালির মধ্যে খাদ্যবস্তু কিছুই নাই বলিলেই চলে। তেমনি আমরা আহার্যের সহিত যে সব তরকারী প্রভৃতি খাই, তাহার খাদ্যমূল্য অতিশয় অল্প। তথাপি পরিপাক ক্রিয়া এবং মল নিঃসরণ ক্রিয়ার পক্ষে উহা অপরিহার্য।

যাহারা কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পান, তাঁহাদিগের পক্ষে শাক প্রভৃতি তরকারী বিশেষ উপকারী। একটি ছড়াও আছে—শাকে বাড়ে মল।

যে সকল খাদ্যে প্রোটিন আছে, তাহার মধ্যে মাংস, মাছ, ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্যই প্রধান। তাই বলিয়া অন্যান্য খাদ্যে প্রোটিন নাই, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। ময়দা, আলু, দুধ প্রভৃতিতেও প্রচুর প্রোটিন আছে। প্রোটিন জাতীয়

খাদ্য অথবা যাহার মধ্যে প্রোটিন অধিক আছে, সেই সকল খাদ্য, অর্থাৎ মাংস, মাছ ইত্যাদি শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী। কিন্তু এগুলি পরিপাক করিতে এবং শরীরের অঙ্গীভূত করিতে (metabolise) পরিপাক যন্ত্রগুলির উপর এবং হৃদ্‌যন্ত্রের উপর অধিক চাপ পড়ে। সেইজন্য এই সকল খাদ্য যাহাতে আমরা বেশি না খাইয়া ফেলি সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আহার্য যতই উপকারী হউক, তাহার পরিমাণের মাত্রা সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যে প্রকার খাদ্যই হউক, তাহা মুখরোচক এবং সহজপাচ্য করিবার জন্য উপযুক্তরূপে রন্ধন করা আবশ্যক। আমিষদ্রব্যের অন্তর্গত প্রোটিন নিরামিষ দ্রব্যের অন্তর্গত প্রোটিন অপেক্ষা সহজে পরিপাক হয়। সেইজন্য শরীরের প্রোটিনের চাহিদা মিটাইতে নিরামিষ অপেক্ষা আমিষ দ্রব্যই অধিক উপযোগী।

ভগবানের একটি আশ্চর্য ব্যবস্থা এই যে মানসিক পরিশ্রমের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ একেবারে নিষ্কর্মা ব্যক্তির শরীর সুস্থ রাখিতে যে খাদ্যের প্রয়োজন, একজন কঠিন মানসিক শ্রমে নিযুক্ত ব্যক্তিরও সেই খাদ্যই যথেষ্ট। এইজন্যই কি তিনি লেখক, সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির জন্য দারিদ্র্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন? কিন্তু Basal metabolism-এর জন্যও তো কিছু খাদ্যের প্রয়োজন, সেকথা নিশ্চয়ই তিনি জানেন!

সাধারণ একজন কর্মীর (যাঁহাকে বাহিরে ঘোরাফেরা করিতে হয়) পক্ষে যে ৩৫০০ ক্যালোরির প্রয়োজন হয়, তাহার

জন্য মোটামুটি ১০০ গ্রাম প্রোটিন, ১০০ গ্রাম স্নেহ (প্রাণীজ) এবং ৪০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আহার করা প্রয়োজন। কোন এক প্রকার খাদ্যই অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। তবে কোন প্রকার খাদ্য ঠিক কতখানি খাইতে হইবে, তাহা ব্যক্তিগত রুচি ও অভ্যাসের উপর অনেক নির্ভর করে। প্রয়োজন মত খাদ্য অপ্রাপ্য হইলে বাধ্য হইয়াই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে হয়।

আমরা যে সকল খাদ্য গ্রহণ করি, তাহার মধ্যে বিবিধ পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তাম্র, আয়োডিন, ম্যাগনেসিয়াম, ফ্লুয়োরিন, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি আছে। তবে এইগুলির পরিমাণ খুব অল্প। শরীরের পক্ষে এগুলিরও প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন আছে। যতই দিন যাইতেছে, ততই এই সকল ভিটামিনের কার্যকারিতা এবং খাদ্য মূল্য সম্বন্ধে প্রতীতি দৃঢ়তর হইতেছে। আমাদের স্বাভাবিক খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজন মত ভিটামিন থাকিবার কথা। কিন্তু নানা কারণে, বিশেষত বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম খাদ্যের প্রচলনের জন্য এবং সাধারণভাবে উপযুক্ত খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য, খাদ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ভিটামিনের অভাব হইলে কৃত্রিম (Synthetic) ভিটামিন দ্বারা তাহা পূরণ করিবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কোন কোন খাদ্যে কোন কোন ভিটামিন কত পরিমাণে আছে তাহা বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণা করিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

শরীরতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তকে ইহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে।

মানুষের যত প্রকার আহার্য আছে, তাহার মধ্যে দুগ্ধের ন্যায় উপকারী আহার্য আর নাই। রাসায়নিক বিশ্লেষণ না করিয়াও ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। নবজাত শিশু বহুদিন পর্যন্ত শুধু দুধ খাইয়াই কেবল বাঁচিয়া থাকে, তাহা নহে, তাহার অস্থি, মজ্জা, মেদ, রক্ত, মাংস প্রভৃতি শরীরের সমস্ত উপাদানের সুস্থতা ও বৃদ্ধি এই দুগ্ধ দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে

দুগ্ধে সাধারণত প্রোটিন, মাখন, শর্করা, লবণজাতীয় উপাদান এবং ভিটামিন, এই সকল পদার্থগুলি বিদ্যমান। গোদুগ্ধ ও নারীস্তন্য তুলনা করিয়া দেখা যায়, নারীস্তন্যে শর্করা একটু বেশি এবং মাখন একটু কম। সেইজন্য গোদুগ্ধে কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া এবং তাহাতে একটু চিনি দিয়া একটু মিষ্ট করিয়া শিশুদিগকে খাওয়ানোর প্রথা আছে। দুধ ফুটাইলে উহা জীবাণুশূন্য হয়। কিন্তু দুধ ফুটাইলে উহার ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায় এবং স্বাদ ও গন্ধেরও কিছু পরিবর্তন হয়। অবশ্য বাড়ীতে নিজেদের প্রয়োজনমত দুধ পাতলা করিয়া বা ঘন করিয়া যেরূপ ইচ্ছা জ্বাল দেওয়া যায় এবং ক্ষীর, সর প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু যে দুগ্ধ বিক্রয়ের জন্য, তাহা যথেচ্ছ জ্বাল দেওয়া চলে না। অথচ বিবিধ গরুর বা মহিষের বিবিধ দুগ্ধ একত্র করিয়া সোজাসুজি বিক্রয় করিলে তাহার মধ্যে নানাবিধ রোগের জীবাণু থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

সেইজন্য দুগ্ধসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দুগ্ধকে পাস্তুরাইজ (Pasteurise) করিয়া বিক্রয় করেন। পাস্তুরাইজ করা ব্যাপারটি বিশেষ কিছুই নয়। দুগ্ধকে ১৪৫° F তাপে আধঘণ্টা গরম করিয়া শীঘ্রই উহাকে ঠাণ্ডা করিয়া ফেলা—ইহাকেই মোটামুটি পাস্তুরাইজ করা বলে। দুগ্ধের ভিটামিন যাহাতে সম্পূর্ণ নষ্ট না হয়, এজন্য তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হয়। পাস্তুরাইজ করা দুগ্ধ সাধারণ দুগ্ধ অপেক্ষা কোন বিষয়েই নিকৃষ্ট নহে। যে দুগ্ধ পাস্তুরাইজ করা নয়, তাহা না ফুটাইয়া খাওয়া উচিত নয়।

বয়স্ক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধপান অতীব হিতকারী। কথায় আছে, বার্ধক্যটা second childhood, দ্বিতীয় শৈশব। সুতরাং শিশুর খাদ্যই বৃদ্ধের পক্ষেও উপযোগী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি ? অবশ্য বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত শরীর নীরোগ থাকে না। সুতরাং রোগের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, যদি খাইয়া সহ্য হয়, তাহা হইলে দুগ্ধ খাওয়া প্রত্যেক বৃদ্ধের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন, ঘোল প্রভৃতি নানা প্রকার সুখাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। রুচি এবং প্রয়োজনমত বিবিধ প্রকারে দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। যে প্রকারেই খাওয়া হউক না কেন, উহা যেন দুষ্পাচ্য না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মানুষের পরিপাক-যন্ত্রগুলি মোটের উপর একপ্রকার হইলেও, প্রত্যেকটি মানুষের পরিপাক-শক্তি অবিকল এক প্রকার নয়। একথা সুস্থ এবং

অসুস্থ উভয় প্রকার ব্যক্তির পক্ষেই প্রযোজ্য। দুইজন সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে একজন হয়তো পাতলা দুধ পছন্দ করেন, আবার আর একজন হয়তো ঘন দুধই বেশি পছন্দ করেন, পাতলা দুধ খাইলে তাঁহার পেটে অস্বস্তিকর উপসর্গ হয়। সুতরাং প্রত্যেকে নিজের অভ্যাস, রুচি ও স্বাস্থ্য বিবেচনা করিয়া যে ভাবে দুগ্ধ খাইলে বেশ 'সহ্য' হয়, সেইরূপেই খাওয়া বাঞ্ছনীয়।

খাদ্যের অন্তর্নিহিত পদার্থ এবং খাদ্যের দোষগুণ সম্পর্কে যাহা বলা হইল, সেগুলি আমাদের মনে রাখা কর্তব্য। তবে কার্যক্ষেত্রে সর্বদা এতদনুসারে খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়তো সম্ভব নহে। কারণ, প্রত্যেকটি খাদ্যের অন্তর্গত পদার্থ (প্রোটিন, স্নেহ ইত্যাদি) কি আছে, কতখানি আছে, তাহার ক্যালোরি-মূল্য কত, তাহাতে ভিটামিন কি কি আছে, এবং আমাদের প্রত্যেকের শরীরের প্রয়োজনীয়তা কি, তাহা সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া এবং গাণিতিক হিসাব দ্বারা স্থির করিয়া তদনুসারে খাদ্যগ্রহণ সম্ভবপর ব্যাপার নহে। এক বাড়ীতে দশজন লোক থাকিলে, তাহাদের বয়স, স্বাস্থ্য, রুচি প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া তদনুসারে বাজার করা এবং বাজার হইতে আনীত দ্রব্য রন্ধন করা কখনই সম্ভব নয়। কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে হয়তো কিছুটা সম্ভব হইল, কিন্তু বাজারে হয়তো সব প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়াই গেল না, বা পাওয়া গেলেও হয়তো তাহার দাম আয়ত্তের বাহিরে। মার জন্য, বাবার জন্য, পিসিমার জন্য, দিদিমার জন্য, খুকীর জন্য, পল্টুর জন্য, কেষ্টর জন্য, হরির মার জন্য, নিজের এবং স্ত্রীর কথাটা না হয় বাদই দিলাম—

ফিজিওলজির ফরমুলা কষিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা এবং বাজারের ব্যবস্থা প্রায় একটা হাস্যকর ব্যাপার। খাদ্যতত্ত্বসম্পর্কে জ্ঞানবান হওয়ায় কোন ক্ষতি নাই। কেন না, knowledge is power একথা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে আমাদের দৈনন্দিন বাজার করা এবং খাদ্যের ব্যবস্থা করিবার সময়ে মোটামুটিভাবে কতকগুলি কথা মনে রাখিতে হইবে।

আমাদের দেশে আমরা পুরুষানুক্রমে যে সকল খাদ্য খাইয়া আসিতেছি, মোটামুটিভাবে তাহা খাইতে পাইলেই, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে। ভাত, মাছ, ডাল, তরকারী, দুধ, ঘি, মাখন, ফল, ডিম এবং মধ্যে মধ্যে মাংস, ইহাই আমাদের সাধারণ খাদ্য। যথাসম্ভব রুচিসম্মতরূপে রন্ধন করিতে হইবে। অথচ যাহাতে খাদ্যগুলি দুষ্পাচ্য না হয়, তাহার দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। উক্ত খাদ্যগুলির মধ্যে আমাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সকল উপাদানের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সে-গুলি সমস্তই আছে। ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে উক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে বিভিন্ন খাদ্যের ন্যূনাধিক্য হইবে। যেমন, স্থূলকায় ব্যক্তির পক্ষে স্নেহজাতীয় খাদ্য বেশি খাওয়া সঙ্গত নয়। অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে খাদ্যা-খাদ্যের বিচার ও ব্যবস্থা করাই সঙ্গত।

খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের কতকগুলি কদভ্যাস আছে, তাহা যত্নসহকারে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। চা-পানের কোন উপকারিতা নাই, চায়ের কোনরূপ খাদ্যমূল্য নাই, ইহা জানিয়াও আমরা এই চায়ের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছি। যাঁহারা চা খান,

তাঁহারা চা ছাড়িয়া দিলেও দেখিবেন, কোনই অসুবিধা হইবে না। একদিন বা দুইদিন হয়তো একটু খারাপ লাগিবে, তাহার পর আর কোন অসুবিধাই বোধ করিবেন না। কফি সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। আমাদের দেশে কফি খাওয়ায় তেমন প্রচলন নাই। দাক্ষিণাত্যে ইহার প্রচলন বেশি। চা ও কফি উভয়ই একান্ত অনাবশ্যক খাদ্য। চা এবং ইহার সহিত বিস্কুট প্রভৃতি যাহা আমরা সাধারণত খাই, তাহা শরীরের পক্ষে উপকারী নয়। যাঁহাদের পরিপাকযন্ত্রের সামান্য প্রকার কোন রোগ বা বৈকল্য আছে, তাঁহাদের পক্ষে চা, কফি প্রভৃতি একেবারে বর্জনীয়। তৎসহ আরো কয়েকটি খাদ্যদ্রব্য ইঁহাদিগকে বর্জন করিতে হইবে। সর্ব প্রকার ভাজা বা শক্ত জিনিষ, যেমন ডালমুট, চীনাবাদাম, বেসন দিয়া ভাজা জিনিষ, চিড়া ভাজা, মুড়ি, খই প্রভৃতি বর্জনীয়। রুটি, পাউরুটি, টোস্ট, বিস্কুট প্রভৃতিও ভাজা জিনিষের মতই বর্জনীয়। তীব্র মশলা (পেঁয়াজ, রসুন, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতি) দিয়া রাঁধা খাবার বর্জন করিতে হইবে। মনে হইতে পারে, এগুলি বাদ দিলে, খাইব কি? কিন্তু এগুলি বাদ দিলেও খাইবার আরও অসংখ্য জিনিষ পাওয়া যাইবে। তালিকা দিয়া আর কি হইবে? একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে, ওইগুলি বাদ দিলেও খাইবার কোনই অসুবিধা হইবে না। নরম ভাত, নরম ডাল, সাদা তরকারি, শুক্ত, নিমবেগুন, কুমড়া, বেগুন, পেঁপে প্রভৃতি সিদ্ধ, আলু পটল প্রভৃতি ভাজা, মাছের ঝোল, অম্বল বা চাটনি, মিষ্ট দই, কুমড়ার মিঠাই,

বেলের মোরব্বা, পাকা পেঁপে, পায়স, চিড়াভিজান ও দই ও কলা, সন্দেশ, রসগোল্লা, পান্তুয়া, হালুয়া প্রভৃতি বহু প্রকার সুখাদ্য ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনানুসারে এবং সামর্থ্যানুসারে খাওয়া যাইতে পারে। অনেকে বলেন, দুবেলার বড় দুটো খাওয়া না হয় হ'ল, কিন্তু সকাল বিকাল জলখাবারের কি করা যায়? এটা নিশ্চয়ই একটা সমস্যা, বিশেষত দুর্মূল্যের বাজারে। কিন্তু এখানেও একটু বিবেচনা ও সতর্কতা অবলম্বন করিলে অনেক সুবিধা হইতে পারে। বহু ব্যক্তির বাঁধা খাদ্য, চা এবং তাহার সঙ্গে বিস্কুট বা ঐরূপ কিছু। যাঁহাদের পেটের কোনপ্রকার অসুখ আছে, তাঁহাদের পক্ষে এই খাবার বিষবৎ পরিত্যাজ্য। সাধারণ সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেও ইহা অপেক্ষা অন্য প্রকার সুখাদ্যই প্রশস্ত। অবশ্য ভাল খাবারের মূল্যও অধিক। কিন্তু সাধারণ চা-বিস্কুটের পরিবর্তে কি খাওয়া যাইতে পারে, তাহার একটু ইঙ্গিত দিতে ইচ্ছা করি। এক কাপ চা'এর মূল্য দুই-আনার কম নহে। সুতরাং অতি সাধারণ চা খাইতেও চারি আনা খরচ হয়। অথচ এই অস্বাভাবিক দুর্মূল্যের সময়েও এই চারি আনায় দুইটি সন্দেশ, দুইটি রসগোল্লা, দুইটি পান্তুয়া, দুইখানা ডালপুরী, প্রায় দেড় পোয়া দুধ, আধ পোয়া ভাল দই, আধ পোয়া ভাল ছানা, চারটি কলা, চারটি পেয়ারা, চারটি শসা, চারখানা বেলের মোরব্বা (বাড়ীতে প্রস্তুত করিলে বারখানা), এক গ্লাস ঘোলের সরবৎ (বাড়ীতে দ্বিগুণ), দুই-গ্লাস চিনির সরবৎ (বাড়ীতে দ্বিগুণ), চারখানা লুচি ও তরকারী (বাড়ীতে তিনগুণ), একখানি

আস্ত আখ, একটি বাতাবী লেবু, একটি ছোট আনারস, এক বাটি চিড়া-দই-কলা, এক বাটি মুড়ি-দুধ-চিনি, এক বাটি খই-দই বাতাসা প্রভৃতি বহুপ্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এদেশের এবং অন্যান্য দেশেরও বহু ব্যক্তি কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পাইয়া থাকেন। তাঁহারা চা-বিস্কুটের পরিবর্তে দুগ্ধ, শসা, কলা, পেয়ারা, বেলের সরবৎ প্রভৃতি খাইলে খাদ্য ও ঔষধ উভয়েরই কাজ হইবে। ইহা শুধু পুঁথিগত তথ্য নহে। বহুক্ষেত্রে ইহা উত্তমরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে। চা-বিস্কুটের মোহ যে কি ভয়ানক তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। জনৈক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কঠিন অন্ত্রের রোগে বহুদিন ভুগিয়া কলিকাতার সর্বপ্রকার চিকিৎসা বিফল করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্বেও চা-টোষ্ট-বিস্কুট খাওয়া হইতে বিরত হইতে পারেন নাই।

সকালে ও বৈকালে ছোট ছেলেমেয়েদের জল খাবারের সমস্যা খুবই প্রবল। বর্তমান অবস্থায় অত্যন্ত সাবধানে খাদ্য-নির্বাচন আবশ্যক। চায়ের ব্যাপারটা তুলিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। অনেক সময়ে অন্য খাদ্যের অভাবে খানিকটা চা গিলিয়াই ক্ষুধার শান্তি করিতে হয় বটে, কিন্তু যথাসাধ্য এ অভ্যাসটি পরিহার করাই কর্তব্য। সকালে ভিজা ছোলা চিনি দিয়া খাওয়া যাইতে পারে। হাতে গড়া রুটি (পাঁউরুটি নয়) একটু চিনি দিয়া বা একটু ডাল দিয়া খাওয়া যাইতে পারে। যাঁহাদের বেশি বেলায়, একটা বা দুইটায় খাওয়া অভ্যাস, তাঁহারা সকালে অল্প পরিমাণে ফেনাভাত ও আলু ভাতে খাইতে

পারেন। সঙ্গে একটু মাখন হইলে আরো ভাল হয়। খই, মুড়ি, মুড়ির সহিত ছোলাভিজা প্রভৃতিও সুখাদ্য। বৈকালে চিড়া-দই, দুধ-মুড়ি, হাতে গড়া রুটি, হালুয়া, লুচি-তরকারী, পেয়ারা, কলা, শসা প্রভৃতি খাদ্য অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে সম্ভব হইতে পারে। ইহাদের খাদ্যমূল্য চা-বিস্কুট অপেক্ষা অতুলনায় গুণে বেশি। যাঁহাদের সঙ্গতি আছে, তাঁহারা যথেষ্ট পরিমাণে মহার্ঘ মিষ্টান্ন, কেক প্রভৃতি এবং আঙুর, বেদানা, আপেল প্রভৃতি খাইতে পারেন। তবে কাহারও পক্ষেই বাজারের মিষ্টান্ন বেশি খাওয়া ভাল নয়।

আহারের বিষয়ে ধনী, নির্ধন, সকলেরই সতর্ক হওয়া কর্তব্য। আমরা আহারে অসতর্ক হইব, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, আহার-বিষয়ে অনিয়ম হইবে, আমরা নিমন্ত্রণ খাইব, এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই ভগবান আমাদের পাকস্থলী এবং পরি-পাক যন্ত্র বিশেষরূপে অত্যাচারসহ করিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। যাঁহারা স্বভাবত আহার-বিষয়ে নিয়মানুবর্তী, তাঁহাদের সহজে পেটের কোনপ্রকার অসুখ হয় না। কখনও কখনও নিমন্ত্রণাদি উপলক্ষে অস্বাভাবিক আহার করিলেও তাঁহাদের তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু অত্যাচারেরও একটা সীমা আছে। এ সীমা ছাড়াইয়া গেলে অসুখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইবে না। ইংরাজিতে একটা কথা আছে, we dig our grave with our teeth. কথাটা সর্বাংশে সত্য না হইলেও অনেক-ক্ষেত্রেই সত্য। আরো একটা মূল্যবান কথা মনে পড়িতেছে। কথাটি এই, if at sixty you want to live like a young

man of twenty, at twenty you should live like an old man of sixty. যাঁহারা ষাট বৎসর বয়সেও যৌবনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিলেই এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

দৈনন্দিন

আমাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের সহিত স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন অসুখ হইলে, তাহার সুচিকিৎসার জন্য দৈনন্দিন অভ্যাস পরিত্যাগ করিতেই হয় এবং চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে চলিতে হয়। যখন এরূপ কোন অসুখ থাকে না এবং চিকিৎসকের বিশেষ কোন নির্দেশ থাকে না, তখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক অভ্যাস মতই চলিয়া থাকি।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিতে অযথা বিলম্ব করা উচিত নয়। একেবারে অন্ধকার থাকিতে উঠিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; তবে অভ্যাস মত প্রতিদিন একই সময়ে শয্যা-ত্যাগ করা কর্তব্য। প্রথমেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা কর্তব্য। অনেকের অভ্যাস আছে, চা না খাইলে বা অন্য কিছু না খাইলে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিতে পারেন না। ইহা ভাল নহে। কাহারও কাহারও একটি অতি কদর্য অভ্যাস আছে, সিগারেট মুখে করিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করেন। এটা যেমন কুরুচিপূর্ণ, তেমনি অস্বাস্থ্যকর। বিশেষ কারণে কোন একদিন হয়তো লেবুর রস বা ঐরূপ কিছুর প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনই নিয়মিত অভ্যাস হওয়া উচিত নয়। প্রত্যহ একই সময়ে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন।

দাঁতন দিয়া বা টুথব্রাশ ও টুথপেষ্টের সাহায্যে ভাল করিয়া দাঁত পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। যদি দাঁতে কোনপ্রকার

উপসর্গ থাকে, তাহা হইলে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন বা তিন দিন ডেটল-মেশানো (চায়ের কাপের এক কাপ জলে তিন ফোঁটা) কুলকুচি করা ভাল।

প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ভগবানের নাম স্মরণ করা কর্তব্য। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, স্বাস্থ্যের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক কি? কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, ভগবানের সহিত সম্পর্ক নাই, এমন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। শরীরের সহিত মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। মন সুস্থ রাখিতে হইলে, ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আমাদের সকল কর্মে, সকল চিন্তায় সকল সাধনার মধ্যে তিনিই বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারই মঙ্গলময় হস্ত আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহ মন পরিচালিত করিতেছেন, এই বিশ্বাস মনে সর্বদা জাগ্রত থাকিলে আমাদের সাধনা সার্থক হইবে। আমাদের জীবন ধন্য হইবে। মনের স্বাস্থ্য হারাইলে শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। সাকার হউন, নিরাকার হউন, তাহাতে কিছুমাত্র আসে যায় না। যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস, তিনি তেমন ভাবেই ভগবানকে স্মরণ করিবেন। কেহ হয়তো বলিবেন, স্বাস্থ্যতত্ত্ব একটা বিজ্ঞান, ইহার সহিত ভগবান কেন? কিন্তু ভগবান যে সর্বাপেক্ষা বড় বৈজ্ঞানিক একথা ভুলিলে চলিবে কেন? মানুষের এত জ্ঞান, এত দম্ভ, কিন্তু এখনও তো কেহ একটি ফুল, একটি দূর্বা, একটি শসা, এক ঝিনুক দুধ বা একটি পিপীলিকা নির্মাণ করিতে পারিল না! কোনদিন পারিবেও না।

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে জীবনকে, জীবনের প্রতি কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। ভগবানে বিশ্বাস না থাকিলে জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় না। শুধু যুক্তি, তর্ক, বিচার দ্বারা জীবন-তরী ঠিকপথে রাখা যায় না। এমন কোন দুষ্কার্য নাই, যাহা তর্ক দ্বারা সমর্থন করা যায় না। মানুষের নীতিবোধ সুগঠিত করিতে ভগবানের অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন। এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বিলাতের একজন মনীষী বলিয়াছিলেন, Even if there be no God, it is time that we should invent one.

প্রাতঃকালে, যে কোন অবসরে, বা শয্যাত্যাগ করিবার পূর্বে শয্যায় বসিয়াই, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া মনে মনে একাগ্র-চিত্তে বলিতে হইবে, 'আমি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে।' কায়মনোবাক্যে ইহা স্মরণ করিতে পারিলে, আমাদের দৈনন্দিন জীবন, দৈনন্দিন কার্য, দৈনন্দিন চিন্তা, সকলই সুপথে চলিবে। অনেকগুলি দিন লইয়াই একটি মাস, মাস লইয়াই বৎসর, বৎসর লইয়াই জীবন। দৈনন্দিন জীবন সার্থক হইলে, জীবনও সার্থক হইবে।

মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি ভগবদ্‌বিশ্বাস। এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন জীবনই সার্থক হইতে পারে না।

প্রতিদিন প্রাতে বা অপরাহ্নে কিছু কিছু ব্যায়াম আবশ্যক। অনেকের ধারণা যে, ব্যায়াম অল্পবয়সেই করিতে হয়, বেশি বয়সে ব্যায়ামের আবশ্যকতা নাই। ইহা ঠিক নহে। অল্প পরিমাণে ব্যায়াম সকল বয়সেই উপকারী। সুযোগ ও সুবিধামত বিবিধ

প্রকার ক্রীড়া দ্বারা এই ব্যায়াম করা যাইতে পারে। যেমন, টেনিস খেলা, ব্যাডমিণ্টন খেলা, পিং-পং খেলা প্রভৃতি। ঘরের মধ্যে মুগুর দ্বারা বেশ ভাল ব্যায়াম হইতে পারে। শুধু উঠা-বসা বা ডন করিলেও ব্যায়াম হয়। বেশি বৃদ্ধ হইলে বা দুর্বল হইলে এবং এই সকল ব্যায়াম করা না গেলে, হাঁটা অভ্যাস করা যাইতে পারে। তবে ইহাতে সময় বেশি লাগে এবং রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতির বাধাও আছে। মোট কথা সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে প্রত্যহই কিছু কিছু ব্যায়াম সকল বয়সের ব্যক্তির পক্ষেই হিতকারী। ইহাতে অগ্নিমান্দ্য, বাত, রক্তচাপ-বৃদ্ধি, বহুমূত্র প্রভৃতি বহু অধিকবয়সোচিত ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে বা ঐ সকল ব্যাধির প্রকোপের উপশম হইতে পারে।

প্রতিদিন একই সময়ে আহার করা কর্তব্য। কোনদিন নয়টায়, কোনদিন একটায়, আহার করিবার অভ্যাস ভাল নহে। এ সম্বন্ধে পূর্বে 'আহারের সময়' নামক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করিতে মিথ্যা ভাষণ পরিত্যাগ করা কর্তব্য। মনের স্বাস্থ্য অপহরণের পক্ষে মিথ্যা ভাষণের মত শক্তি আর কিছুরই নাই। বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করিতে নাই। বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করা ভগবানের বিরুদ্ধে কাজ করারই সমান, কারণ আমাদের বিবেক বুদ্ধি ভগবানেরই দান। কাহারও কাহারও ধারণা যে সাংসারিক ও সামাজিক বৃহৎ বৃহৎ কার্য সম্পাদন করিতে গেলে মিথ্যাচরণ করা ব্যতীত উপায়

নাই। এই মিথ্যাচরণকে সাধারণতঃ tact, diplomacy, প্রভৃতি নাম দিয়া উহার কদর্যতা ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এরূপ মিথ্যাচরণ করিয়া পরিণামে মোটের উপর কাহারই কোন লাভ হয় না। কারণ যিনি মিথ্যাচরণ করেন, তাঁহার মনে হয়, যে তাঁহার মিথ্যাচরণ কেহ বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু মিথ্যাবাদীর ন্যায় বা মিথ্যাবাদী অপেক্ষাও বেশি বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে সংসারে আছে, যে বিষয়ে তাহার জ্ঞান থাকে না। আমরা যাহাকে সাধারণতঃ tact বা diplomacy বলি, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রতারণা ও মিথ্যাচারেরই নামান্তর। আমাদের দৈনন্দিন কার্যে এই ধরণের কার্য হইতে বিরত হইলে মন প্রসন্ন থাকিবে। মন প্রসন্ন থাকিলে শরীরও প্রসন্ন হইবে। শিশু-দিগকে ভুলাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত অন্যায়। শিশুদের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ফলে, শিশুরাও মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্ত হয়। বাড়ীতে থাকিয়া চাকরকে বা পুত্রকে দিয়া বলান, 'বাড়ী নাই', অত্যন্ত কদর্য অভ্যাস। অপ্রিয় কথা এড়াইতে গিয়া নিজের ইতর মনের পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ইহা অপেক্ষা সোজাসুজি বিনীত ও শিষ্টভাবে সত্য কথা বলিয়া দেওয়াই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী। মিথ্যা কথা বলা একবার অভ্যাস হইয়া গেলে ইহা ক্রমশ সমস্ত জীবনকেই কলুষিত করিয়া ফেলে। সর্বপ্রকার পাপকার্যের প্রধান সহায় মিথ্যা কথা।

অল্পবয়সে অত্যধিক মস্তিষ্কচালনা বা অত্যধিক পড়াশুনার চাপ স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। প্রথম বয়সে প্রধানত শারীরিক

স্বাস্থ্য এবং পুষ্টির দিকেই বেশি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইতে পারে।

বেশি বয়সেও নিজের সাধ্যাতিরিক্ত কার্য হইতে বিরত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বা নিতান্ত জীবন-ধারণের প্রয়োজনে মানুষকে অনেক সময়ে সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। এরূপ করিতে গিয়া হয়তো মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে হয়। কিন্তু এইরূপ বিশেষ কারণ ব্যতীত শুধু অধিক অর্থের লোভে বা শুধু বাহ্য প্রশংসালাভের লোভে বহু ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্য সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। একটু অনুসন্ধান করিলেই আপনারা দেখিতে পাইবেন, বহু লোক আছেন, যাঁহারা প্রভূত অর্থের অধিকারী, তথাপি শুধু আরো অধিক অর্থ সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্যেই নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য উপেক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যসম্মত বিধি নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া দ্রুত মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছেন। সরল মনে, প্রসন্ন মনে, ধীরে অথচ অনলসভাবে, নিজের শরীরের সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসারে যতখানি কাজ করা সম্ভব তাহার বেশি কার্য করিতে গেলেই স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে। বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা আবশ্যক।

মানুষের মনে ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি যে সকল দুষ্প্রবৃত্তি আছে, সেগুলিকে দমিত করিতে না পারিলে মন প্রসন্ন হইতে পারে না। মন প্রসন্ন না হইলে শরীরও সুস্থ থাকে না। বয়স্ক এবং রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে একথা অতীব সত্য।

সুতরাং ভগবানকে স্মরণ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সৎসঙ্গ, সদালোচনা প্রভৃতি দ্বারা মনের সাম্য ও শান্তি বিধান করিতে পারিলে শারীরিক স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইয়া থাকে।

বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে রাত্রিজাগরণ একেবারেই উচিত নয়। নিরুদ্বিগ্নমনে বহুক্ষণ নিদ্রাসুখ উপভোগ করা কর্তব্য। স্বাস্থ্য-রক্ষায় সুনিদ্রার মোহিনী শক্তি আছে। রাত্রের আহার একটু সকাল সকালই সম্পন্ন করা কর্তব্য। রাত্রি নয়টার পর কোন বয়স্ক ব্যক্তিরই বেশি অধ্যয়নাদি করা কর্তব্য নহে।

বৈকালে দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মের শেষে অনেকক্ষণ পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। এই সময়ে লঘু আলাপ-আলোচনা, বাড়ীতে বাগান বা ফুলগাছ থাকিলে তাহার যত্ন, গৃহস্থালীর টুকিটাকি কাজ প্রভৃতি করা যাইতে পারে। তাহার পরে কোন এক প্রকারের স্বল্প ব্যায়াম, অগত্যা খানিকটা হাঁটা, এই সকল কার্যে মন প্রফুল্ল থাকে, শরীরও অনেকটা স্ফূর্তি লাভ করে।

কোনরূপ মাদকদ্রব্য বা নেশার বশীভূত হওয়া কর্তব্য নয়। চা, কফি, সিগারেট, তামাক প্রভৃতি আপাতত নির্দোষ মনে হইলেও, বহুদিনের অভ্যাসের ফল ভাল নয়। হুকার তামাক অবশ্য তেমন ক্ষতিকর নয়, কিন্তু ইহারই বা কি প্রয়োজন? অন্য কোন দোষ থাকুক বা নাই থাকুক, বৃথা সমস্ত মুখটাকে অবিরত দুর্গন্ধময় করিয়া রাখিয়া কি লাভ? সম্প্রতি বহু চিকিৎসক অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধূমপান হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে হানিকর। সুতরাং সখ করিয়া, অর্থব্যয়

করিয়া এই সকল অভ্যাস করা কেন? একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন, ধূমপায়ীদের ফুসফুস কাটিয়া যদি দেখান যায়, তাহা হইলে কোন ধূমপায়ী আর ধূম পান করিতে চাহিবেন বলিয়া মনে হয় না।

মানুষের যত প্রকার ঐশ্বর্য আছে তাহার মধ্যে তাহার ভগবদ্‌ভক্তিই সর্বাপেক্ষা বড় ঐশ্বর্য। তাহার পরেই তাহার স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য না থাকিলে অন্য কোন ঐশ্বর্যই তাহাকে সুখী করিতে পারে না। প্রায় চার বৎসর পূর্বে 'সৌভাগ্য'-নামে একটি ছোট গল্প লিখিয়াছিলাম। গল্পটি একটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু পরে শুনিলাম, গল্পটি হারাইয়া গিয়াছে। গল্পটির সারাংশ এই—

এক বহুলক্ষপতি ধনীর বিরাট অট্টালিকার নীচে পথের পাশে রোয়াকের একটি কোটরে একটি মুচি জুতা সেলাই করিত। সে প্রত্যহ দেখিত, কত বড় বড় গাড়ী সেই বাড়ীতে আসিতেছে, যাইতেছে। কত বিচিত্র বেশভূষা, কত বিচিত্র অলংকার, কত বিচিত্র হর্ষ-কোলাহল! সেই মুচির এক বন্ধু একদিন তাহার কোটরে আসিয়া বসিল এবং খৈনী খাইতে খাইতে গল্পসল্প করিতে লাগিল। গেটের ভিতর হইতে একখানি বিরাট গাড়ীতে ঐ অট্টালিকার অধিপতিকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া বন্ধুটি বলিল, লোকটির কি সৌভাগ্য! আচ্ছা, যদি তুই ওই গাড়ী আর বাড়ীর মালিক হ'স আর ওই বাবু যদি এখানে বসে জুতো সেলাই করে, তাহলে কেমন হয়?

মুচি উত্তর দিল, মোটেই ভাল হয় না।

বন্ধু বলিল, কেন? তুই আর ওই বাবু অদল বদল হলে তুই রাজা হয়ে যাবি।

উঁহু।

কেন?

উঁহু।

পাস নে, তাই খাস নে। কেউ তো আর সত্যি বদলা-বদলি করে দিচ্ছে না। যদি হয়, তাহলে কেমন হয়, তাই জিজ্ঞেস করছিলাম। যদি—

মুচি বলিল, যদি সত্যি হয়, তাহলেও আমি এ অদল বদল চাই নে।

নাঃ, চাই নে? ন্যাকামি রাখ।

সত্যিই আমি চাই নে।

মুচির দৃঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বন্ধু বলিল, আচ্ছা, কেন চাস না বল তো।

ও বাবুর কোমরের নীচে থেকে আরম্ভ করে দুটো পা-ই একেবারে অবশ।

এ গল্পটা বাস্তব জীবনে অতি সত্য। পাঠকবর্গের মধ্যে কাহাকেও যদি বলা যায়, আপনাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পা-দুটি অবশ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা হইলে কেহ সম্মত হইবেন কি?

একটা কথা আছে, শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। সংসারের সকল প্রকার ধর্মসাধন বা কর্তব্য পালনের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষাই প্রধান। এ কথাটি যেন আমরা কখনো না ভুলি।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক ঃ

সরস প্রবন্ধ ও গল্প	লেখা ৩৲
সরস গল্পের বই ঃ	শুভশ্রী ১॥০
	মজলিস ১॥০
	কথিকা ১॥০
	ভজহরি ১॥০
	রঙ্গ-অঙ্ক-পি ২॥০
প্রবন্ধ ঃ	গণিতের ভিত্তি ॥০
	শিক্ষার কথা ২৲
উপন্যাস ঃ	পূর্ণিমা ৩॥০
গল্প সংগ্রহ ঃ	ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প ৫
কবিতা ঃ	ভাগীরথী ১॥০
নাটক ঃ	কংসের গরু ২৲
ভাষাবিষয়ক ঃ	A German Word Book for beginners 1/8
	A French Word Book for beginners 1/-
জীবনী ঃ	বাংলার একটি বিস্মৃত রত্ন ১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬